পার্বত্য চট্টগ্রাম:

নিপীড়ন ও সংগ্রাম

সম্পাদনা ▫ বদরুদ্দীন উমর

পার্বত্য চট্টগ্রাম

নিপীড়ন ও সংগ্রাম

সম্পাদনা : বদরুদ্দীন উমর

সংস্কৃতি প্রকাশনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম

গ্রন্থস্বত্ব : সংস্কৃতি প্রকাশনী

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০৪, মে ১৯৯৭

প্রকাশক :
সংস্কৃতি প্রকাশনীর পক্ষে
ফিরোজ আহসান
৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ :
রবীন আহসান

মুদ্রণ ও অক্ষর বিন্যাস :
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৬০ টাকা

PARBATTA CHATTAGRAM - NIPIRON O SANGRAM : Edited by Badruddin Umar. A Collection of articles and interviews, published by Sanskriti Prokashani, 68/2, Purana Paltan, Dhaka-1000, Price Taka 60.00 , US $ 5.00

সূচিপত্র

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের ওপর শোষণ নির্যাতন, তাদের প্রতি বিপুল অধিকাংশ বাঙলাদেশী মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক লোকজন ও বুদ্ধিজীবী, বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলসমূহ ইত্যাদির বৈরী মনোভাব এবং ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের একের পর এক সরকার যে নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করে আসছে তার মধ্যে বাঙলাদেশের সমগ্র শাসক শ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রই উন্মোচিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সেই সাথে এই শাসক শ্রেণী যে বাঙলাদেশের কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী জনগণেরও শোষক নিপীড়ক এবং তাঁদের স্বার্থে কোন নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করতে অক্ষম, এটাও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ যে জাতির শাসক শ্রেণী অন্য জাতিকে শোষণ করে, তাদেরকে নিপীড়ন করে, তারা যে নিজেদের জাতির জনগণেরও শোষক নির্যাতক এটা ইতিহাসে প্রত্যেক সমাজ ও দেশে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় সামরিক সরকার, নির্বাচিত সরকার যে রকম সরকারই হোক, একই উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতির ভিত্তিতে বাস্তবত একটানাভাবে সামরিক শাসন জারি রেখেছে। এখনো "মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র পতাকাবাহী এবং শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক শক্তি" বলে আত্মপ্রচারকারী দল আওয়ামী লীগের শাসন আমলেও অনেক গণতান্ত্রিক বুজরুকি এবং পাহাড়ি জনগণের পরিত্রাতার ভূমিকা সত্ত্বেও এদেশের ও সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ খেদমতগার হিসেবে তারা যে শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামে বহাল রেখেছে তাকে সামরিক শাসন ছাড়া অন্য কোনভাবে আখ্যায়িত করা চলে না।

সম্প্রতি ভারতীয় সরকারের সাথে বাঙলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কয়েক হাজার শরণার্থী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবির থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজেদের এলাকায় ফিরে এসেছেন। সেখান থেকে আরও বহু সংখ্যক শরণার্থীর আসার কথা, যদিও তাঁদের আগমন এখন কিছুটা ধীরগতি হয়েছে। এইসব ফেরৎ আসা বা প্রত্যাগত শরণার্থীকে সরকার সাময়িকভাবে রেশন দিচ্ছে এবং তাদের পুনর্বাসনের কথা বলছে। কিন্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কিভাবে কিরকম হবে, তার কোন নির্ভরযোগ্য পরিকল্পনা এখনো জানা যায় নি। অন্যদিকে, এই প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য জমি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনা শিবিরগুলি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সরকারি কোন পদক্ষেপ বস্তুতঃপক্ষে কিছুই নেই। সেটা এখনো চুক্তিভুক্ত প্রতিশ্রুতির পর্যায়েই আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতীয় সরকার এখন অতিশয় ব্যস্ত ও ব্যগ্র হওয়ার কারণ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কিছুদিন থেকে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি। আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল এখন রাজনৈতিকভাবে খুব উত্তপ্ত এবং এই উত্তাপ সেখানে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতের এই সব অঞ্চলের সশস্ত্র বিদ্রোহী ও বিপ্লবীরা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নিযুক্ত বিভিন্ন দলভুক্ত লোকেরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলকে প্রয়োজনমতো আত্মরক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করে এসেছে। তারা পাকিস্তানে এবং বাঙলাদেশেও, কখনো সরকারের সম্মতি ও সহযোগিতা নিয়ে, কখনো বা সরকারি সম্মতি ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলকে ব্যবহার করেছে। এটা বন্ধের জন্য বাঙলাদেশে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে উভয় সরকারের মধ্যে আলোচনা ও ঐক্যমত হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এভাবে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ স্থগিত হয় নি।

এখন নোতুন করে আবার ভারতের ঐ অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম বেশ ব্যাপক হওয়ায় ভারত সরকার বিশাল আকারে সেখানে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেছে। কেন্দ্র থেকে কিছুদিন আগে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য তারা আসামে নিয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিদ্রোহীরা যাতে ব্যবহার করতে একেবারে না পারে, সে জন্যই বাঙলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তি করেছে এবং এই চুক্তির তাগিদে তারা পানি বন্টন, ট্রানজিট, বাণিজ্য চুক্তি, এশিয়ান হাইওয়ের পূর্ব পরিকল্পিত রুট পরিবর্তন করে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নোতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে তড়িঘড়ি করে অনেক চুক্তি করেছে।

অন্যান্য বিষয়ে এই সব চুক্তি বাঙলাদেশ সরকার কর্তৃক কার্যকর হওয়ার যতই সম্ভাবনা থাক, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত যে লোক দেখানো চুক্তি তারা করেছে সে অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের কোন সমস্যার সমাধান হবে মনে করার কোন কারণ নেই। যে আওয়ামী লীগ সরকার এই চুক্তি করেছে তারা নিজেরাও পাহাড়ি জনগণের কোন বন্ধু নয়, উপরন্তু বাঙলাদেশের জন্মের পরে থেকেই তারা তাদের সব দাবি দাওয়া অগ্রাহ্য করেছে, এমনকি তাদের নেতা শেখ মুজিবর রহমান পাহাড়ি জনগণের নিজস্ব জাতিসত্তা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে তাদেরকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার "হুকুম" দিতেও কোন দ্বিধা অথবা অসুবিধে বোধ করেন নি (তৎকালীন পত্রপত্রিকা দ্রষ্টব্য)। সেই আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর আবার ক্ষমতায় এসে তার শ্রেণীগত চরিত্র পরিবর্তন করে চট্টগ্রামের নিপীড়িত পাহাড়ি জনগণের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে এটা ভাবা মূঢ়তারই সমতুল্য। কাজেই এখানে চক্রান্ত আছে এবং এই চক্রান্তের ব্যাপারে ভারত ও বাঙলাদেশ উভয় সরকারই গভীরভাবে সম্পর্কিত। পাহাড়ি জনগণের একাংশের ধারণা, ভারতীয় সরকার তাদের বন্ধু। তাদের এই ভুল ধারণার অবসান ঘটতে পারে মাত্র একটি পথে—উভয় দেশের শাসক শ্রেণীর ফাঁদে পা না দিয়ে নিজেদের জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ব্যাপকভাবে সংগঠিত করে, এমন এক সংগ্রাম সংগঠিত করে যাতে বাঙলাদেশের পাহাড়ি ও সমতলবাসী জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে শোষক শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।

এই ঐক্য যাতে না হতে পারে এজন্য প্রথম থেকেই বাঙলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র এক বিভেদ নীতি কার্যকর করে চলেছে সেখানে বাঙালিদেরকে

পুনর্বাসিত করে, পাহাড়ি তাড়িয়ে তাদের জমিজমা বাঙালিদের মধ্যে বন্টন করে, তাদেরকে মালিকানা ও দখলি স্বত্ব দিয়ে। এভাবে যে সব বাঙালিকে তারা বসাচ্ছে তাদের অধিকাংশই আবার সমতলের বিভিন্ন জেলায় নিজেদের জমিজমা ভিটে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া গরীব লোক। তাদেরও আশ্রয় দরকার, জমি দরকার, কাজ দরকার। কিন্তু এই আশ্রয়, জমি ও বিশেষত কাজের ব্যবস্থার জন্য অন্যদেরকে তাদের জমি থেকে উৎখাত করা এবং তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব একমাত্র তাদেরই পক্ষে যারা চরিত্রগতভাবে হলো শোষক ও নির্যাতক। এ কারণে ভারতীয় সরকারের সাথে চুক্তির মাধ্যমে তারা যত সংখ্যক পাহাড়িকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরিয়ে আনুক তাদেরকে জমি ও কাজ দেবার ক্ষমতা ও প্রকৃত ইচ্ছে বাঙলাদেশ সরকারের নেই। তাছাড়া এভাবে যে চুক্তি তারা করেছে সেটা ভারতের প্রয়োজনের চাপেই তারা করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই এই চুক্তির যে মূল লক্ষ্য, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের কোন তৎপরতা পার্বত্য চট্টগ্রামে চলতে না দেওয়া—সেটা তারা যথেষ্ট আগ্রহ ও যথাসাধ্য যোগ্যতার সাথেই করতে চেষ্টা করবে।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের পার্বত্য এলাকায় তৎপরতা শুধু ভারত সরকার নয়, বাঙলাদেশ সরকারের জন্যও অসুবিধাজনক ও ক্ষতিকর। তাই এটা যাতে হতে না পারে সে ব্যাপারে ভারত ও বাঙলাদেশ সরকার পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করবে, এমনকি যৌথ সামরিক তৎপরতার মাধ্যমেও করবে।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার তা হলো, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের সশস্ত্র তৎপরতার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের যোগসূত্র সাধারণভাবে থাকার কথা নয়। নয় এ জন্য যে, উভয়ের মধ্যে স্বার্থের কোন যোগসূত্র আপাতঃদৃষ্টিতে নেই। কারণ ভারত সরকারের সাহায্য সহযোগিতার ওপর পাহাড়ি শরণার্থীদেরকে নির্ভর করতে হয় এবং পাহাড়ি অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে তাদের জন্য ভারতই হয়ে দাঁড়ায় একটা আশ্রয়স্থল। তাই তারা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের সাথে স্বার্থগতভাবে একাত্ম নয়। সেই হিসেবে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগেরও কারণ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের সাথে ভারতের বিদ্রোহীদের এই সম্পর্কের কারণেই ভারত সরকার বিদ্রোহীদের তৎপরতা বন্ধের ব্যাপারে এবং তাদের চলাচল অথবা তৎপরতার খবরাখবরের জন্য পাহাড়িদের ওপর নির্ভর করতে অথবা তাদেরকে কাজে লাগাতে চায়। অন্তত এটাই ভারত সরকারের একটি অঘোষিত প্রত্যাশা। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কোন গোপন সমঝোতা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

আসলে পাকিস্তান আমলে অথবা বাঙলাদেশ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ, বি. এন.পি, অথবা জাতীয় পার্টির শাসন আমলে, কোন সময়েই উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের বিদ্রোহীরা পাহাড়ি জনগণ অথবা জন সংহতি সমিতির সাথে সম্পর্কিত থাকে নি। তাদের সম্পর্ক থেকেছে

বাঙলাদেশ সরকার ও তার সেনা বাহিনীর সাথে, যারা কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী তৎপরতাকে সাহায্যের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদেরকে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে এসেছে। এটা বিশেষ করে হয়েছে বি.এন.পি. ও জাতীয় পার্টির আমলে।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীরা যাতে বাঙলাদেশে এসে সরকার অথবা পাহাড়ি জনগণ, কারও কোন সাহায্য সহযোগিতা না পায় এটা নিশ্চিত করার জন্যই সম্প্রতি এ বিষয়ে ভারত ও বাঙলাদেশের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তিতে পাহাড়ি জনগণের কোন উল্লেখ না থাকলেও এক্ষেত্রে তাদের সংশ্লিষ্টতা যে থাকার কথা তাতে সন্দেহের কারণ নেই।

যেহেতু বাঙলাদেশের উগ্র বাঙালিদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা লাভের জন্য জমাজমি ভিটেবাড়ি, থেকে উৎখাত হওয়া পাহাড়িদেরকে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে হয়, সে কারণে এটা ধরেই নেওয়া হয় যে, পাহাড়িরা হলো ভারতের চর অথবা ভারতের প্রতি তাদের আনুগত্য সন্দেহাতীত। এটা ঠিক যে, ভারতের প্রতি অনেক পাহাড়ির দরদ ও সম্ভাব্য ভবিষৎ নির্ভরশীলতার চিন্তা আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা ভারতীয় চর অথবা সাম্প্রদায়িক। তবে তাদের বিরুদ্ধে যে একটানা জাতীয় নিপীড়ন চলছে তার ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে একটা বিদ্বেষ আছে, যা তাদেরকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই কাটিয়ে উঠতে হবে। অন্যথায় তাদের সংগ্রাম সমগ্র বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং তার ফলে তাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিও ঠিকমতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে ভারত–বাঙলাদেশের যে চুক্তি হয়েছে তার কতকগুলি দিক বর্তমান বাঙলাদেশ সরকারের মনঃপূত নয়। যেমন সেখানকার তিন জেলায় তিনটি ক্যান্টনমেন্ট বাদে অন্য সব সামরিক ঘাঁটি ও ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়া, অথবা ফিরে আসা শরণার্থীদের জন্য জমি, কাজ ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরাসরি কিছু বিরোধিতা করতে আপাতত না পারলেও তাদের শ্রেণীগত মিত্র বি.এন.পি., জামাতে ইসলামিসহ অন্য প্রতিক্রিয়াশীল এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী দলগুলি এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারকে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে সাহায্য করছে। এই সাহায্য হচ্ছে চুক্তির বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক ও জোরদার আন্দোলন করা যাতে চুক্তির ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতার অজুহাত দেখিয়ে তারা চুক্তির উপরোক্ত দফাগুলি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে পারে। আওয়ামী লীগের সাথে উপরের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির যতই বিরোধ থাকুক, এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেকার উগ্র জাতীয়তাবাদী ঐক্য একটি বাস্তব ব্যাপার।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালি জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বাধিয়ে ও জিইয়ে রাখার ব্যাপারে সরকারসহ বাঙলাদেশের সমগ্র উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ একযোগে কাজ করছে। এজন্য অতি সম্প্রতি, মাত্র কয়েকদিন আগে, বি.এন.পি.র উদ্যোগে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের একটা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মেলন হয়েছে এবং সেই সম্মেলনে, বি.এন.পি., জামাতে ইসলামীসহ বেশ কয়েকটি ইসলামপন্থী দল

পাহাড়ি অঞ্চলে যে অসংখ্য সামরিক ক্যাম্প আছে সেগুলি উঠিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছে এবং হুমকি দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিদেরকে উত্তেজিত করার জন্য তারা সেখানে হরতাল ডাকছে, সেখানে মিটিং মিছিল করছে।

বাঙলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের সংগঠন 'জনসংহতি সমিতি'র মধ্যে এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আলোচনা হচ্ছে। বলা চলে, দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা সর্বশেষ বৈঠকের মাধ্যমে এখন প্রায় শেষ হয়েছে। উভয় পক্ষের কথা অনুযায়ী অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হবে। চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত না হলেও তার মূল দিকগুলি ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

এ ধরনের আলোচনা আগেও হয়েছে। কিন্তু ঠিক বর্তমান পর্যায়ে এই আলোচনাকে ভারত বাঙলাদেশ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে। আপাতঃদৃষ্টিতে অথবা সাময়িকভাবে এই আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের যত বাহ্য আড়ম্বর ও ব্যবস্থাই হোক, এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান কোন উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্রেণী ও তাদের কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবিত চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের মধ্যে জমির মালিকানা ও দখলিস্বত্ব সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী নিজেদের জমি থেকে উৎখাত হয়ে যে পাহাড়িরা ভারতে শরণার্থী হিসেবে ছিলেন, এখনো আছেন, অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামেই বসবাস করছেন তাঁদেরকে জমি ফেরৎ দেওয়া হবে। এজন্য তাদের জমি দখলকারী বাঙালিদের হাত থেকে উদ্ধার করার কথা বলা হয়েছে। এইভাবে ইতিমধ্যে দখলকৃত জমি চাষবাস, তার ওপর বাড়িঘর তৈরি করা, গাছপালা লাগান হয়েছে। সেগুলি যে বাঙালি দখলকারীরা এতো সহজে ছেড়ে দেবে এটা মনে করার বিশেষ কারণ নেই। বিশেষত এইভাবে নোতুন বসতিকারী বাঙালিদেরকে জমি থেকে 'উৎখাত' করার বিরুদ্ধে বি.এন.পি., জামাতে ইসলামি, জাতীয় পার্টি ইত্যাদির ধর্মঘট, জনসভা, মিছিল ইত্যাদি খোলাখুলি তৎপরতা এবং পর্দার আড়াল থেকে আওয়ামী লীগের পরোক্ষ সমর্থন যেখানে আছে, সেখানে এভাবে বাঙালিদেরকে দখলকৃত জমি থেকে উঠিয়ে দেওয়া যে সহজ ব্যাপার নয় সেটা সহজেই বোঝা যায়। কাজেই চুক্তির এই দিকটি কতদূর কার্যকর হবে তার কোনই নিশ্চয়তা নেই।

অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে, বাঙালিদেরকে পাহাড়িদের জমি থেকে সরিয়ে এনে তাদেরকে সরকারি খাস জমির ওপর বসানো হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুল অধিকাংশ জমিই এখন সরকারি খাসে। বনবিভাগের জমি থেকে শুরু করে অন্য অনেকভাবে জমি সরকারি খাস জমি হিসেবে আছে। এই সব জমি বাঙালিদেরকে বসতিস্থাপন ও চাষ আবাদের জন্য দেওয়া হবে। বাঙালিরা সেখানে কিভাবে জমিজমা পাবে, বসতিস্থাপন ও চাষ আবাদ করবে সে বিষয়ে কোন অনিশ্চয়তা রাখা হয়নি। কিন্তু এই সব জমি পাহাড়িদেরকেও বসতিস্থাপন ও চাষাবাদের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হবে, এ রকম কোন

কথা চুক্তিতে থাকবে কিনা বলা হয়নি। সে রকম কোন কথা চুক্তি পূর্ব ঘোষণায় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এ অবস্থায় ভারত থেকে ফিরে আসা এবং নিজেদের জমি থেকে বেদখল হওয়া পাহাড়িদের মধ্যে জমি কিভাবে নোতুন করে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে সেটা অনিশ্চিতই বলা চলে।

এখানে আরও একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলাদেশের সমতল ভূমিতে জমির মালিকানার দলিল ও কাগজপত্র যেভাবে থাকে, সরকারি নথিপত্রে যেভাবে তার রেকর্ড থাকে, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের জমির মালিকানার ক্ষেত্রে সে রকম কিছু নেই। সেখানে ঝুম চাষ ইত্যাদি যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে হয়ে এসেছে তাতে সে রকম রেকর্ড এর কোন ব্যবস্থা কোন সময়ে থাকেনি। এ কারণে তাঁদের মালিকানা নির্ধারণের ব্যাপারে এক মস্ত জটিলতা এবং আইনগত ফাঁক আছে। এই ফাঁকের কারণে সরকার ও বাঙালি দখলকারীরা জমি থেকে উৎখাত হওয়া পাহাড়িদের জমির স্বত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে পাহাড়িদেরকে ফাঁকি দেওয়ার অনেক সুযোগ পাবে। এই সুযোগের যথাযথ ব্যবহার যে তারা করবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

এই পরিস্থিতিতে জমি থেকে উৎখাত হওয়া পাহাড়ি ও বাঙালি বসতকারীদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে চুক্তি হয়েছে সেটা কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণভাবে একটা কাগুজে চুক্তি হিসেবেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা।

চুক্তির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা বাহিনী প্রত্যাহার অর্থাৎ সোজাকথায় সেখান থেকে সামরিক শাসন উঠিয়ে নেওয়া। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় তিনটি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া অনত্র থেকে সব সামরিক ঘাঁটি ও ছাউনি প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু একথা বলা হলেও বাস্তবত সেখান থেকে থানা পর্যায়ের সামরিক ঘাঁটিগুলি যে সরিয়ে নেওয়া হবে না, তার যথেষ্ট ইঙ্গিত বেশ খোলাখুলিভাবে নানা কথা বার্তার মধ্যে রাখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও বি. এন.পি. জামাত, জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সব থেকে প্রভাবশালী অংশের তৎপরতা বেশ লক্ষণীয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি সংসদীয় আসনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন এবং আগেও হয়েছিলেন। এই নির্বাচনের সময় তাঁদের ভোটের একটা খুব বড়ো অংশ বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের থেকেই এসেছে। কাজেই এই বাঙালিদেরকে জমি থেকে উঠিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনাবাহিনীর ঘাঁটি ও ছাউনি প্রত্যাহার করে তাদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি আওয়ামী লীগের পক্ষে এক মহা অসুবিধাজনক ব্যাপার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী যেভাবেই প্রত্যাহার করা হোক, তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র-অংশ 'শান্তি বাহিনী' কর্তৃক সরকারের কাছে নিজেদের অস্ত্র সমর্পন। এই অস্ত্র সমর্পন হবে, যদিও স্বাভাবিকভাবে কিছু অস্ত্র তারা যে নিজেদের হাতে রেখে নেবে, অন্তত কিছু দিনের জন্য রেখে নেবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেভাবে রেখে দেওয়া অস্ত্র চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধের সৃষ্টি করবে না। অন্যদিকে, সরকার সামরিক ঘাঁটি ও ছাউনী অনেক জায়গা

থেকে আপাতত প্রত্যাহার করলেও সেই সব ঘাঁটি ও ছাউনী প্রয়োজন অনুযায়ী আবার নোতুন করে স্থাপন করতেও তাদের কোন অসুবিধেই হবে না।

চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনে জনসংহতি সমিতির সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা। এই অংশগ্রহণের পদ্ধতি কি হবে তার কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের মধ্যে ইতিমধ্যে সরকারের সাথে আপোষকারী ও তার মাধ্যমে লাভবান হওয়া যে অংশ সৃষ্টি হয়েছে তাদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। পাহাড়িদের মধ্যে এভাবে যে সুবিধাভোগী অংশটি গড়ে উঠবে তা যে গরীব পাহাড়িদের পক্ষে কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ অথবা সহায়তা প্রদান করবে সেটা মনে করার কারণ নেই। উপরন্তু সরকারের সাথে সহযোগিতা করে তারা সে আন্দোলনের বিরোধিতাতেই নিযুক্ত থাকবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি সত্তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে সামগ্রিকভাবে তাদের সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম যে নোতুন শর্তাধীনে নোতুনভাবে সংগঠিত হতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে পাহাড়ি জনগণকে নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সামগ্রিকভাবে শোষক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এই সংগ্রাম না করে যদি বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া রূপে তাঁরা বিভিন্ন পাহাড়ি জাতিসত্তার উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করতে নিযুক্ত থাকেন অথবা বাঙলাদেশের সমগ্র সমতলভূমির গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বিযুক্ত রাখেন তাহলে তাঁদের সংগ্রামের কোন অগ্রগতি হবে না। উপরন্তু, বাঙলাদেশ ও ভারতের শোষক শাসক শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ এবং নিপীড়ন নির্যাতনের নীতি সহজেই বহাল রাখতে ও কার্যকর করতে পারবে।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম : নিপীড়ন ও সংগ্রাম' নামে বর্তমান সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলিতে এ সব বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করি, এই সংকলনটি বাঙলাদেশের পাহাড়ি ও সমতল ভূমির গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিরা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গুরুত্বের সাথে পাঠ করবেন এবং পাহাড়ি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম যাতে সমগ্র বাঙলাদেশের জনগণের শোষণ শাসন মুক্তির সংগ্রামের সাথে যুক্ত হতে পারে সেই চেষ্টা করবেন।

এটা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, একটি দেশে জাতিগত শোষণ নির্যাতন শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী নির্যাতন উচ্ছেদ না হলে সম্ভব নয়। সে কারণে ওপরে যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কথা বলা হলো তাকে অনিবার্যভাবেই পরিণত হতে হবে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে। সমাজতন্ত্রের এই সংগ্রাম বাঙলাদেশের সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলে জাতি, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমেই গড়ে তুলতে ও শক্তিশালী করতে হবে।

বদরুদ্দীন উমর
১৯. ৫. ১৯৯৭

বদরুদ্দীন উমর

পার্বত্য চট্টগ্রামে শোষণ, জাতিগত নিপীড়ন ও তার থেকে মুক্তির সংগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার উপরে যে শোষণ-নির্যাতন এখন জারি রয়েছে সেটা নোতুন নয়। যেভাবে ও যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা জারি রয়েছে তার মধ্যেও কোনো নোতুনত্ব নেই।

যে কোনো শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় জাতি দ্বন্দ্ব একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য বিশ্বে এমন কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নেই যেখানে জাতি দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত অথবা, তুলনায় শক্তিশালী জাতি দূর্বলতর জাতি ও জাতিসত্তার উপর শোষণ নির্যাতন অব্যাহত রাখে না। শুধু তাই নয়। যে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতি সমস্যার সমাধান করে সেখানে শ্রেণী শোষণের ভিত্তি উৎখাতের সঙ্গে সঙ্গে এবং তার সঙ্গে তাল রেখেই জাতিগত শোষণ নিপীড়নও বন্ধ করা হয়। পশ্চাৎপদ জাতিসত্তাসমূহকে উন্নত করার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপই নেওয়া হয়। কিন্তু সেই দেশটিতে যদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে তাহলে, সেই সঙ্গে শ্রেণী শোষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে জাতিগত শোষণ নিপীড়নও যথাসাধ্য পুরাতন কায়দাতেই আবার শুরু হয়, ঠিক যেমনটি ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে।

শ্রেণী শোষণ ও জাতিগত শোষণ, আঞ্চলিক শোষণ ও বৈষম্য ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে অকারণে কোনো সমাজে ক্রিয়াশীল থাকে না। এটা ক্রিয়াশীল থাকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কারণে এবং সামাজিক নিয়ম অনুয়ায়ী। এর উপর কোন বিশেষ ব্যক্তির কোন হাত থাকে না। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তির ইচ্ছা নিরপেক্ষ, সে ব্যক্তি যতই বৃহৎ ও মহৎ হোক না কেন।

১৯০০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার Hill Tracts Regulation 1900 নামে যে আইনটি প্রণয়ন করেন সে অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসীদের জন্য এলাকাটি বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ১৩টি জাতিসত্তা দ্বারা গঠিত এই আদিবাসীরা ব্যতীত অপর কোনো এলাকার লোকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ অথবা বসবাসের জন্য এই আইন অনুযায়ী বিশেষ অনুমতি বা ডেপুটি কমিশনার প্রদত্ত পারমিটের প্রয়োজন হতো এবং তাদেরকে এই পারমিট দেয়া হতো এক বৎসরের জন্য।

সেই আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের কোনো চেষ্টা না থাকলেও তাঁদের জীবন কিছুটা নিশ্চিন্ত রাখার, নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির রীতিনীতি অনুযায়ী নিজেদের জীবন যাপনের একটা নিশ্চয়তা ছিলো।

ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার এই অঞ্চলের জনগণের জন্য তখন এই ব্যবস্থা নির্ধারণ করার কারণ তাদের জাতিগত নিপীড়ন বিমুখতা নয়। সেটা তৎকালে তারা করেছিলো

মূলত এ কারণে যে, ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ সালের রাষ্ট্র বিভক্তির পর যেভাবে প্রতিটি অঞ্চলে শোষণ নিপীড়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তখনকার আমলে সে সুযোগ ছিলো না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজেদের শোষণ নিপীড়নের জন্য সেভাবে ব্যবহার করার মতো অর্থনৈতিক অবকাঠামোও সে আমলে তৈরী হয় নি।

কাজেই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এবং ১৯৭১ সালের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর Hill Tracts Regulation 1900 এর প্রায় সমস্ত কিছুই বাতিল করে দিয়ে এই অঞ্চলে শ্রেণী শোষণের সঙ্গে তাল রেখে জাতিগত নিপীড়নের পথ অবাধ ও প্রশস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

জাতিগত নিপীড়ন প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে ও সচেতনভাবে মনে রাখা দরকার এবং সেটি হলো এই যে, নিপীড়ন শ্রেণী শোষণেরই একটি বিশেষ দিক। এজন্য যে সমাজে জাতিগত নিপীড়ন আছে সেখানে শ্রেণী শোষণের অস্তিত্ব অবধারিত এবং যে সমাজে শ্রেণী শোষণ আছে সেখানে যদি একাধিক জাতির বাস থাকে তাহলে সেখানে কোনো না কোনোভাবে জাতিগত শোষণ এবং দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকতেই হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এক্ষেত্রে দেশটি উন্নত অথবা পশ্চাৎপদ যে কোনো ধরনের হতে পারে। কারণ এই সম্পর্ক পশ্চৎপদতার অথবা উন্নতির থেকেই সৃষ্টি হয় না। শ্রেণী শোষণ এই সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং তাকে জায়মান রাখে।

এ বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার এ কারণে যে, এদিকে খেয়াল না থাকলে জাতিগত শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম নানাভাবে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনাকে বিশ্বের অনেক দেশে ও সমাজে বাস্তব রূপ লাভ করতে দেখা গেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামও এদিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রম নয়।

দুর্বল জাতি অথবা জাতিসত্তার উপর শোষণ নিপীড়ন জারি রাখার জন্য, সেটাকে ব্যাপকতা প্রদানের জন্য দরকার সেই জাতি ও জাতিসত্তা অধ্যুষিত এলাকায় অধিকতর শক্তিশালী জাতির লোকদের অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করার জন্যই ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে "পাহাড়িয়া অঞ্চল" হিসেবে সংরক্ষিত না রেখে সেখানে বহিরাগতদের বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে Hill Tracts Regulation 1900 এর গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধগুলি বাতিল করেন। তারপর থেকেই ধীরগতিতে হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের এই অনুপ্রবেশ শান্তিপূর্ণ অথবা নিরূপদ্রব ছিল না। কারণ এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তারই সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভাঙন সৃষ্টির সব রকম প্রক্রিয়া দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭১ সালের পর থেকে এই প্রক্রিয়া সেখানে এক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক প্রতিনিধিদল বাঙলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অঞ্চলকে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার এবং তার জন্য বাঙলাদেশের নোতুন সংবিধানে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

এই দাবি উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং প্রতিনিধিদলটিকে বলেন স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন না করে তারা নিজেরাই যাতে বাঙালি হতে পারেন সেই চেষ্টা তাদেরকে করতে হবে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য জনগণের প্রতি এই একই উপদেশ খয়রাত এবং হুমকি প্রদর্শন করেছিলেন (তৎকালীন পত্রপত্রিকা দ্রষ্টব্য)।

শুধু হুমকি প্রদর্শনই নয়, সেই হুমকির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের, সেখানকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জন্য কোনো ব্যবস্থাই রাখেন নি। উপরন্তু পাকিস্তানি আমলের থেকে অধিকতর হারে সেখানে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং সেখানে তাদেরকে বসতি স্থাপনের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

আওয়ামী লীগ শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত যে নীতি কার্যকর হতে শুরু করে তার বিরুদ্ধে সেখানে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং প্রতিরোধও হতে থাকে। সংগঠিত এই প্রতিরোধের একটা প্রতিফলন ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনেই আওয়ামী লীগ গোষ্ঠীর (আওয়ামী লীগ ও জাসদ) প্রার্থীদের পরাজয় এবং মানবেন্দ্র লারমাদের নির্বাচন জয়ের মধ্যে।

১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকার উৎখাত হয়ে জিয়াউর রহমানের কর্তৃত্বাধীন সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বাধীন 'জনসংহতি পরিষদ' বেআইনি ঘোষিত হলে দলটি নিজেকে বিলুপ্ত না করে গোপন সংগঠনে রূপান্তরিত করে এবং তারপর 'শান্তিবাহিনী' নামে এক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম পরিচলানায় নিযুক্ত হয়।

এই সংগ্রাম দমন করার উদ্দেশ্যে জিয়াউর রহমান এক দ্বিমুখী নীতি নির্ধারণ করেন। একদিকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে থাকেন এবং অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম মোকাবেলার লক্ষ্যে ঐ অঞ্চলের পাহাড়ি জনগণের (১৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার) বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন সেনাবাহিনীর এক অবিরাম সশস্ত্র অভিযান। এই দ্বিমুখী আক্রমণের মাধ্যমে একদিকে সেখানকার আদি অধিবাসীরা যেমন নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হতে থাকেন তেমনি অন্যদিকে নানা ধরনের সশস্ত্র সরকারি বাহিনীর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে তাঁদের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত হতে থাকে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত বা পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ইতিহাসে নেই।

এই নির্যাতন ও শোষণ প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে মৌলিক কারণে মুজিবের আওয়ামী লীগ শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলির উপর শোষণ নির্যাতনের এক নোতুন প্রক্রিয়া জারি করা হয় সেই একই কারণে জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে তার ব্যাপকতা এবং নির্মমতা বৃদ্ধি পায়। এবং সে কারণটি হলো ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের পর নোতুন বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তারা জনগণের কোনো অংশ ছিলো না। তারা ছিলো এ দেশের শোষক শ্রেণীর অংশ এবং প্রতিনিধি। পাকিস্তানি আমলে তৎকালীন পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ছিলো ছোট তরফের শোষক। এই শোষকরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনগণের উপর নিজেদের শোষণ শাসন নোতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে নিযুক্ত হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণসহ সারা বাঙলাদেশের জনগণের উপর চালিয়ে যায় এক তীব্র শোষণ-নির্যাতনের রাজত্ব। শুধু তাই নয়, এই বুর্জোয়ারা বা নব্য ধনীকরা মুলত ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক বুর্জোয়া হওয়ার কারণে এদের চারিত্রিক মান হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট। এই নিকৃষ্ট বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান বাঙলাদেশের জনগণের উপর যে শোষণ নির্যাতন জারি রাখেন ও সেই শোষণ নির্যাতন ব্যবস্থাকে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দিতে থাকেন তার সাথে সম্পর্কিতভাবেই তাঁরা নির্ধারণ করেন তাঁদের পার্বত্য

বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বুঝতে হবে এবং সেটা বুঝতে সক্ষম হলে শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে বর্ধিত অনুপ্রবেশ নীতি, জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে ১৯৭৬ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭৮ সালে উপজাতীয় কনভেনশন (Tribal convention), এরশাদের আমলের সামরিক অভিযান, গুচ্ছগ্রাম, পার্বত্য জেলা পরিষদ ইত্যাদির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা এবং এ সবের তাৎপর্যও উপলব্ধি করা সহজ হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে বিরাট সংখ্যক বাঙালিকে বসতি স্থাপনের জন্য ঠেলে দেয়া হচ্ছে তারা নিজেরাও যে নিজেদের এলাকা থেকে শোষণ ও দারিদ্র্যের চাপে উৎখাত হয়েই অন্যত্র জীবিকা ও কাজের সন্ধানে সেখানে উপস্থিত হচ্ছেন এ বিষয়টি ভুলে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি জনগণ নিজেদের সংগ্রামকে সঠিক পথে চালনা করতে পারবেন না।

আগেই বলা হয়েছে যে, জাতিগত নিপীড়ন কোনো সমাজে সাধারণভাবে শোষণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই যাঁরা শোষিত হতে হতে নিজেদের ভিটে ও জমিজমা থেকে এবং এলাকা থেকে উৎখাত হচ্ছেন তাঁরা অধিকতর নিপীড়িতদের মধ্যে গিয়ে কিছুটা সুবিধা লাভের চেষ্টা করছেন। শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা এভাবে এক ঢিলে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা করছে। পরিস্থিতির এ দিকটি যাতে অনুপ্রবেশকারীরাও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন তার জন্যও পাহাড়ি জনগণকে প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং সেইভাবে তাদের মধ্যে প্রচার প্রচারণা সংগঠিত করতে হবে। কারণ অনুপ্রবেশকারীদের একটি অংশকে

হাতিয়ার হিসেবে বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদের ও শোষকদের প্রতিনিধিরা ব্যবহার করলেও অন্যেরা সেরকম নয়। তাদের অধিকাংশই নিজেরা দারুণভাবে শোষিত এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকবলিত।

এদিক দিয়ে বিচার করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী ১৩টি জাতিসত্তার জনগণ এবং অনুপ্রবেশকারী বাঙালি জনগণের একটি ঐক্যের ভিত্তি আছে এবং সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। এবং সেটা করতে পারলেই সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি জাতিসত্তা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে (যেখানে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই অনুপ্রবেশকারী বাঙালি) বাঙালিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবন ধারণ ব্যবস্থা সংরক্ষিত এবং পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্কিত হয়ে বিকাশ লাভ করতে পারে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি জাতিসত্তার জনগণকে যেমন নিজেদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, তেমনি তাঁদেরকে সংগ্রামকে করতে হবে সমগ্র বাঙলাদেশে শোষণ ও শোষণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য। এক দিক দিয়ে এই দ্বিতীয় সংগ্রামই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, শোষণমুক্ত বাঙলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম না হলে এই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে, শুধু এই রাষ্ট্রীয় কাঠামো নয়, কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই যথার্থ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা সম্ভব নয়।

সাপ্তাহিক প্রত্যয়ন ২৪. ৭. ৯১

৪ . ৮. ১৯৯১

‘জীবন আমাদের নয়’

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কাছে খাগড়াছড়ির এক বৃদ্ধ নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, “সামরিক বাহিনীর লোকজন সর্বত্রই আমাদের উপর নজর রাখছে। জীবন আমাদের নয়। তারা শিশুদেরকে মারপিট করে এবং বাচ্চারা স্কুলে যায় না।” (The Report of the Chittagong Hill Tracts commission, May 1991 P. 110)

১৯৯০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে Chittagong Hill Tracts Commission ভারত ও বাঙলাদেশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী শিবির এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করেন। ১৯৯০ এর ২৯শে নভেম্বর কমিশন ঢাকা এলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের চূড়ান্ত অনুমতি তাঁরা লাভ করেন ডিসেম্বরের ৮ তারিখে অর্থাৎ এরশাদের পতনের ঠিক পর পরই। তদন্ত কালে কমিশন সদস্যরা চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা ইত্যাদি বিভিন্ন পাহাড়ি জাতিসত্তা ও বাঙালি জাতিভুক্ত

ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

Life is not Ours নামে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটিতে বিস্তারিতভাবে বণি পাহাড়ি জনগণের জীবন ও জীবিকার যে চিত্রটি পাওয়া যায় সে চিত্র একটি গণতান্ত্রি সরকারের অধীনস্থ কোনো গণতান্ত্রিক সমাজের চিত্র নয়। সে চিত্র হলো বন্দীশালার এ এক বিশাল সামরিক ক্যাম্পের।

এই সামরিক ক্যাম্প ও তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বন্দীশালার কোনো পরিব বাঙলাদেশে এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনের পতন এবং একটি সংসদী 'গণতান্ত্রিক' সরকার প্রতিষ্ঠার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে নি। সামরিক আমলে তাদে জীবন যেমন তাদের ছিল না, ঠিক তেমনি এখনো তাদের জীবন তাদের নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের উপর পাকিস্তানি ও বাঙালি উ জাতীয়তাবাদের শোষণ নির্যাতন কোনো নোতুন ব্যাপার নয়। Chittagong Hi Tracts Regulation 1900 এ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ি জাতিসত্তাভুক্ত জনগণের জন্য যে সব অধিকার সংরক্ষিত ছিলো এবং ঐ অঞ্চলে বাইরের লোকদে প্রবেশ ও বসতি স্থাপনের উপর যে বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন ছিলো, সেগুলি ১৯ সাল থেকেই উঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তখন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে এক মুসলমান প্রধান অঞ্চল করার যে অগণতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ করা হয় সেই নীতি বাঙলাদেশ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমে আওয় লীগ সরকার এবং তার পর থেকে প্রত্যেকটি সরকারই অনুসরণ ও কার্যকর ক আসছে। এই দুই পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমে যেখানে লক্ষ্য ছি অঞ্চলটিকে একটি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে পরিণত করা, সেখানে বাঙলাদেশ আমলে লক্ষ্য হলো, অঞ্চলটিকে একটি বাঙালি প্রধান অঞ্চলে পরিণত করা। কিন্তু বাস্তবত এ "পার্থক্য" কোন পার্থক্যই নয়, কারণ পাকিস্তান আমলে যে মুসলমানদের প্রবেশ সেখ ঘটতে শুরু করেছিলো তারা ছিলো মূলত বাঙালি এবং এখন সেখানে যে বাঙালিদে বসতি স্থাপনের নীতি কার্যকর করা হচ্ছে সে বাঙালিরা হলো মূলত মুসলমান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জাতিসত্তাভুক্ত জনগণের পক্ষ থেকে আওয়ামী লী সরকারের কাছে যখন স্বায়ত্বশাসনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিলো এবং সেই সা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সেখা বাঙালিদের বসতিস্থাপনের নীতি রদ করার দাবি জানানো হয়েছিলো, তখন সেই স দাবি বিবেচনার প্রশ্ন বাতিল করে দিয়ে শেখ মুজিব তাঁদেরকে হুমকি দেখিয়ে বলেছিলে বাঙালি হয়ে যেতে! শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী–বাকশালীদের এ নীতিই পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সামরিক শাসন আমলে আ বিকশিত করে কার্যকর করা হয়েছে। জিয়াউর রহমানের আমলেই সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্র একটি সামরিক ছাউনিতে পরিণত হয়েছিলো এবং এই সামরিক ছাউনি এরশাদে

আমলে পেয়েছিলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। বাঙলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র "প্রাতিষ্ঠানিক" রূপ লাভ করার পর এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক উপস্থিতির এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপের কোনো পরিবর্তন হয় নি, —'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।'

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন রিপোর্টে পাহাড়ি জনগণের জীবনের যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়, সে চিত্র আমাদেরও অজানা নয়। কিভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সেখানকার জনগণের জমি-জমা দখল করে তাঁদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে বাঙালিদের মধ্যে সেগুলি বন্টন করা হচ্ছে, কিভাবে সেখানে কাজের সংস্থান পাহাড়িদের জন্য ক্রমশ কমে আসছে, কিভাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব পাহাড়ি জনগণের জীবনকে বিপর্যস্ত করছে তার রিপোর্ট আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং অনেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এই সব রিপোর্টের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম-কমিশন রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই।

উপরোক্ত মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও অথবা সামান্য থাকলেও তার উপর পার্বত্য চট্টগ্রামে অতিরিক্ত যে নির্যাতন পাহাড়ি জনগণের উপর চালানো হয় সেটা হচ্ছে তাঁদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান করার চেষ্টা এবং সামরিক বাহিনীর লোকজন কর্তৃক পাহাড়ি নারীদেরকে ধর্ষণ করা, শিশুদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করা, যুবকদের উপর নানা রকমভাবে আক্রমণ চালানো এবং তাদেরকে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা ইত্যাদি। এসব বিষয়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টে অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

বাঙলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই দুইভাবে পাহাড়ি জনগণের জীবন, জীবিকা ও জীবনধারা পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রথমত, সমগ্র এলাকাতে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা—রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে সামরিক উপস্থিতি ব্যাপক ও জোরদার করে সেখানে নানাভাবে শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, সমতল ভূমি থেকে বাঙালিদেরকে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের বসতি স্থাপন, তাদেরকে জমি বরাদ্দ করা, তাদের চাকরীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এভাবে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি এবং অবাঙালি জাতিসত্তাগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে পাহাড়ি জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা।

এক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই দ্বিতীয় নীতি ও দ্বিতীয় ধরনের কার্যকলাপ বেশি বিপজ্জনক। কারণ এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে, এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে, দ্বন্দ্ব বিরোধ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে শোষক-শাসক শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে নির্যাতিত ও শোষিত জনগণের একটি অংশ অপর একটি অংশকে শত্রু মনে করছে এবং বাস্তবত শত্রুতা বাধিয়ে রেখেছে।

এ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার এজন্য যে, সরকার যে বাঙালিদেরকে নিয়ে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করাচ্ছে তারা অবস্থাপন্ন অথবা সম্পত্তিশালী

বাঙালি নয়। তারা এমন এক শ্রেণীর বাঙালি যারা নিজেরাও ভূমিহীন, সহায়সম্বলহীন, যারা নিজেরাও বলতে পারে, "জীবন আমাদের নয়"। জীবন তাদের না হওয়ার কারণেই তারা নিজেদের সমতল ভূমির গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায়, পাহাড়ি অঞ্চলের নোতুন পরিবেশে, জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে বাঙলাদেশের এক অঞ্চলের শোষিত নির্যাতিত কিছু লোককে অন্য অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে সেখানকার শোষিত নির্যাতিত জনগণের বিরুদ্ধে স্থাপন করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে রেখে তাদের উভয়ের শত্রুরাই লাভবান হচ্ছে।

জাতি দ্বন্দ্বে ঘটনাচক্রে জড়িত জনগণের এই দুই অংশের মধ্যেই চেতনার অভাব আছে, যে কারণে তারা নিজেদের সাধারণ শত্রুকে চিহ্নিত করতে না পেরে পরস্পরকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, ঠিক যেমনটি হিন্দু মুসলিম অথবা বাঙালি বিহারিরা বৃটিশ ও পাকিস্তানি আমলে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সাধারণ শত্রুর স্বার্থ উদ্ধার করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিলো।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে সমতল ভূমিতে নির্যাতিত বাঙালিদের মধ্যে কিছু লোককে নিয়ে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করালেও সেখানে পাহাড়িদের তুলনায় বাঙালিদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। কারণ সমতলভূমিতে শোষক শাসক শ্রেণীর শোষণ নির্যাতনে জমিজমা সহায় সম্বল হারালেও পাহাড়ি অঞ্চলে তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কিছুটা লাভ করছে, যদিও সেটা তাদের জীবনের মান খুব উন্নত করছে সেটা বলা চলে না। উপরন্তু পাহাড়িদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে সেখানে তাদের মধ্যে এক নোতুন ধরনের নিরাপত্তার অভাব ঘটছে যে অভাব সমতলভূমিতে তাদের ছিলো না। পাহাড়িদের উপর যেমন বাঙালিদের, বিশেষত বাঙালি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ চলছে, তেমনি বাঙালিরাও মাঝে মাঝে স্বাভাবিকভাবেই আক্রান্ত হচ্ছেন পাহাড়িদের দ্বারা। এভাবেই সরকারের devide and rule নীতি পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যকর হচ্ছে।

পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে 'জনসংহতি সমিতি' ও 'শান্তি বাহিনী' নামে তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও সক্রিয় রয়েছে। এ দুয়েরই সৃষ্টি প্রতিক্রিয়া হিসেবে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে 'জনসংহতি সমিতি' এবং সামরিক নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে 'শান্তি বাহিনী'। এই সত্যটিকে অস্বীকার করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। 'শান্তি বাহিনী' ভেঙে দিয়ে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার অথবা ভারত থেকে পাহাড়ি শরণার্থীদেরকে ফিরে আসার সরকারি আহ্বান কিছুতেই বাস্তবত ফলপ্রসু হতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত না পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙলাদেশ সরকারের সামরিক বাহিনীর বর্তমান উপস্থিতি প্রত্যাহার করা হয়, তাঁদের স্বাভাবিক জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়।

এখানে বিস্ময়ের (?) ব্যাপার এই যে, বাঙলাদেশের বাঙালিরা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এলেও তাঁদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন সম্পর্কে ঠিকমতো খবরাখবর রাখেন এবং এই সামরিক শাসনের বিরোধী। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাতে ইসলামির মতো সরাসরি পুঁজিবাদী দলগুলিতো বটেই এমনকি বামপন্থী নামে পরিচিত দলগুলির মধ্যেও এ নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই, যদিও কেউ কেউ বিশেষত এই শেষোক্তরা, কালে ভদ্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করে থাকে।

আসলে আমাদের দেশে সামরিক শাসনের একটা বাহ্যিক অবসান ঘটলেও যে-ভিত্তির উপর সামরিক শাসন দাঁড়িয়েছিলো সেই স্বৈরতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ভিত্তির কোন পরিবর্তন সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে হয় নি এবং হতেও পারে না। তাই সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র এখনো বজায় আছে এবং জনগণের জীবনেও কোন পরিবর্তন আসে নি। সারা বাঙলাদেশের কোন অঞ্চলেই শ্রমজীবী জনগণের জীবনও আসলে তাঁদের নয়। তাই তাঁরাও খুব সত্য অর্থেই পাহাড়ি জনগণের মতো বলতে পারেন, "জীবন আমাদের নয়"।

বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা এবং অবাঙালি এলাকায় সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী থাকা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্যই কারা প্রকৃত গণতন্ত্রী, জনগণের স্বার্থের জন্য প্রকৃতপক্ষে কারা দাঁড়ায় তার হিসেবের ক্ষেত্রে বাঙালি অবাঙালির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য অথবা তারতম্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

উর্দুর বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন করেছিলেন বলে যাঁরা নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করেন তাঁরাই যখন পাহাড়ি জনগণকে অথবা উর্দুভাষী জনগণকে নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ করে বাঙালি হয়ে বাংলা চর্চার উপদেশ বা নির্দেশ দেন, তখন তাঁদের বাংলা ভাষা প্রেম ও গণতান্ত্রিক চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় সহজেই উদ্‌ঘাটিত হয়। এ দিকটির বিষয়ে আগের যে কোন সময়ের থেকে বেশী সচেতন হওয়ার সময় এখন এসেছে।

'বাঙালি বনাম বাঙলাদেশী' নামে এক ধরনের বিতর্ক আমদানী করে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একটি সহজ সরল ব্যাপারকে ঘোলাটে করে জনগণকে নানাভাবে আজ বিভ্রান্ত করছে। আসলে বাঙালি ও বাঙলাদেশীর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। বাঙলাদেশের অধিবাসী হিসেবে, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাঙালি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, গারো প্রভৃতি সকলেই বাঙলাদেশী। কাজেই বাঙলাদেশী হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার মধ্যে মুসলমানিত্ব অথবা সাম্প্রদায়িকতা নেই, যদিও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও তার উগ্র জাতীয়তাবাদী বিরোধীরা এভাবেই ব্যাপারটিকে উপস্থিত করে থাকে।

অন্য দিকে বাঙলাদেশের অধিবাসীদের সকলকে বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে বাঙলাদেশী শব্দটি ব্যবহারের যারা বিরোধিতা করে তার উগ্রজাতীয়তাবাদী, স্বৈরতন্ত্রী ও ফ্যাসিবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের জীবন, জীবনযাত্রা ও সংগ্রাম প্রসঙ্গে এসব কথা বলার দরকার এ জন্যই যে, যারা বাঙলাদেশে প্রকৃত একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করবেন তাঁদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে উপেক্ষা করা চলবে না। উপরন্তু তাঁদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে হবে এবং নিজেদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে তাঁদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে গ্রথিত করে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

একমাত্র এভাবেই বাঙালি এবং পাহাড়িসহ অপরাপর সংখ্যালঘু জাতিসত্তাভুক্ত জনগণের জীবনকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা সম্ভব যাতে "জীবন আমাদের নয়" এর পরিবর্তে তাঁরা জোর গলায় ঘোষণা করতে পারেন, "জীবন আমাদের"।

১৫.১০.১৯৯১

'আজকের কাগজ

২৯.১০.১৯৯১

জীবন আমাদেরই

বাঙলাদেশে এখন ধনসম্পদের মালিকানা, উৎপাদন সম্পর্ক সাধারণ পশ্চাৎপদতা যেভাবে ও যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে কোটি কোটি মানুষের জীবনের উপর দখলদারি বজায় রয়েছে মাত্র কয়েক লক্ষ লোকের। ধনসম্পদের মালিকানা, উৎপাদন সম্পর্কের উপর নিয়ন্ত্রণ, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া ইত্যাদির জোরে এই কয়েক লক্ষ লোকই এখন বলতে পারে 'জীবন আমাদের'। জীবন মানুষকে যা দিতে পারে তার সবকিছুই নিজেদের হাতের মুঠোয় রাখার জন্য তারা কোটি কোটি মানুষের উপর শোষণ নির্যাতন জারী রেখেছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত সুবিধা ইত্যাদি তো বটেই, সেই সঙ্গে বিলাসিতার নানা ব্যবস্থা তারা নিজেদের জন্য এ পর্যন্ত নিশ্চিত করেছে।

এই অল্পসংখ্যক লোক শোষক-শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত হিসেবে শুধু যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও সামাজিক সম্পর্কের উপরই নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে তাই নয় ; যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, এমনকি অপরিহার্য, সেই প্রক্রিয়ার উপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ খুব শক্তিশালী। এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি এবং পরিণতিও তারাই এখনো পর্যন্ত নির্ধারণ করে থাকে। একটি নোতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাঙলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকেই যে ধনিক শ্রেণী গঠিত হতে থাকে, তারা মূলত কোনো

উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত না থেকে নানা ধরনের লুটতরাজের মাধ্যমেই নিজেদেরকে একটি শ্রেণী হিসেবে গঠন করে। লুটতরাজের এই রাজত্ব এখন পর্যন্ত এ দেশে শুধু যে কায়েম রয়েছে তাই নয়, তাদের সে রাজত্ব এখন এমনভাবে সংগঠিত হয়েছে, যাতে করে লুটপাটকারিদের পক্ষে বিদ্যমান আইনের শাসনকে ভয় করে চলার কোনো কারণ নেই। বাঙলাদেশের আইন কানুন বাস্তবত এখন তাদেরই হাতের মুঠোয়। তারা যাই করুক তার জন্য কোনো প্রকৃত শাস্তি নেই ; খুব জোর তাদের জন্য এ সব ক্ষেত্রে আছে বিচার ও শাস্তির প্রহসন। এ কারণে আজকের বাঙলাদেশে শুধু এরাই বলতে পারে, 'জীবন আমাদের'।

জিয়াউর রহমান ও এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে 'বৈধ' শাসন চালু করার জন্য বাঙলাদেশের উপরোক্ত লুটতরাজকারিদের প্রতিনিধি–স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলি ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে এবং এখনো নিয়ন্ত্রণ করছে। এই নিয়ন্ত্রণের জোরে তারা আমাদের পশ্চাৎপদ জনগণকে এতদিন বুঝিয়ে এসেছে যে, অবৈধ সামরিক শাসনের পরিবর্তে বৈধ সংসদীয় শাসনের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং এই পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনই একমাত্র পথ। তাদের এই ফর্মুলা অনুযায়ী দক্ষিণ ও বামপন্থী সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করে এখন সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করেছে।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বিগত নির্বাচনে সংসদে নির্বাচিত হয়েছে শুধু তারাই যারা ধনী ব্যক্তি, যারা নির্বাচনের সময় অবাধে অগাধ টাকা পয়সা খরচ করতে পেরেছে। শুধু টাকা পয়সা খরচ করেই নির্বাচনে সকলে জিততে না পারলেও যারা জয়লাভ করেছে, তারা প্রত্যেকেই ধনী। একজনও দরিদ্র, এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যক্তি সংসদের আসন অলঙ্কৃত করতে পারেন নি। এর থেকেই বোঝা যায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও এ ধরনের নির্বাচন ধনী দরিদ্রের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নয়। এ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবেই ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতায় যাওয়ার ও ক্ষমতা রদবদলের একটি বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া তাদেরই যারা আজ বলতে পারে 'জীবন আমাদের', এ প্রক্রিয়া তাদেরই যাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে জীবন যাপন ও জীবন উপভোগের সকল সরঞ্জাম।

সংসদীয় ব্যবস্থায় "জনপ্রতিনিধিদের" এই চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে সহজেই বোঝা যাবে, এতো নির্বাচনী হৈহল্লা ও নির্বাচনোত্তর বিজয় উল্লাস সত্ত্বেও জনগণের জীবনের দখলদারি কেন এখনো অন্যদের হাতে---শ্রেণীগতভাবে তাদের হাতে যাদের হাতে সেটা আগেও ছিলো। বোঝা যাবে, কেন অবৈধ সামরিক শাসন উচ্ছেদ হয়ে বৈধ সংসদীয় শাসন কায়েম হওয়ার পরও কৃষক ক্ষেতমজুরদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না, বরং তার আরও অবনতি ঘটে। বোঝা যাবে, কেন এই বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও শ্রমিকদেরকে দাবিদাওয়া নিয়ে ঠিক আগের মতোই সংসদীয় সরকারের

সঙ্গেও লড়তে হয়, প্রস্তুতি নিতে হয় বৃহত্তর লড়াইয়ের। সংসদে নির্বাচিত এবং সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে ধারণা ঠিক থাকলে বোঝা যাবে, কেন ছাত্রদের মধ্যে তারা সংঘর্ষ বাঁধিয়ে রাখছে, কেন তারা জনগণের বিভিন্ন অংশকে বিভক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে চক্রান্ত করছে। বোঝা যাবে, কেন তারা সংসদে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো নিকৃষ্ট কালাকানুন বাতিলের জন্য উচ্চবাচ্য না করে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে চুপচাপ আছে। বোঝা যাবে, কেন তারা এই ধরনের অসংখ্য কালাকানুন জনগণের জীবনের উপর চাপিয়ে রেখে এমন অবস্থা বজায় রেখেছে, যাতে জনগণের কোনো অংশেরই পক্ষে বলা সম্ভব নয়, "জীবন আমাদের"।

কাজেই কোনো সরকার "বৈধভাবে" ক্ষমতায় আছে না "অবৈধভাবে" ক্ষমতায় আছে, তার সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের, তাঁদের জীবিকার ও জীবনের নিশ্চয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ ক্ষেত্রে "অবৈধ" সামরিক শাসন এবং "বৈধ" সংসদীয় শাসনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এবং তফাৎ যে নেই বাঙলাদেশের জনগণ আজ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

বৈধতার প্রশ্ন তুলে রাজনীতির ক্ষেত্রে আসর জমাতে পারে তারাই, যারা আসলে এ সমাজের কোনো আমূল পরিবর্তন চায় না, যারা চায় না জনগণকে তাঁদের জীবনের দখলদার হতে দিতে। কারণ এই বৈধতার সঙ্গে সম্পত্তি মালিকানা, উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণী শোষণ নির্যাতন পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক যেমনটি সে সম্পর্ক নেই সামরিক শাসনের "অবৈধতার" সঙ্গে। তাই এই বৈধতার প্রশ্নটি অবতারণা করার আসল উদ্দেশ্য প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বৈধতার কথা যারা বলে তাদের কেউ কেউ আবার বলে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের কথা। এটাও জনগণের ও কর্মীদের সঙ্গে প্রতারণারই নামান্তর। কারণ "বৈধভাবে" বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। উপরন্তু বিদ্যমান বৈধতার অবসান ঘটিয়েই ঘটে বিপ্লব, এবং সমাজতান্ত্রিক আইনকানুন সমাজে প্রবর্তন সম্ভব বিদ্যমান পুঁজিবাদী আইনকানুনের উচ্ছেদ সাধন করেই।

এ সব বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যাবে যে, তথাকথিত বৈধতার নাম করে যারা জনগণকে পথ দেখাবার "চেষ্টা" করে, তারা জনগণকে কানাগলির মধ্যেই আটকে রাখে—যে ধরনের কানাগলির মধ্যে জনগণ বিগত সংসদীয় নির্বাচনের পর আটকা পড়েছেন।

আগেই বলেছি যে, কোনো ধনী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে বসার অধিকার লাভ করে নি। ধনসম্পদের মালিকানার সঙ্গে তাই এই অধিকারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শুধু তাই নয়। এই মালিকানা, আইনগতভাবে না হলেও, প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবত সংসদ সদস্য হওয়ার এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ঠিক এ কারণেই যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে গেছে, তারা সকলেই ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি–জনগণের প্রতিনিধি বা স্বার্থ রক্ষাকারী তারা কেউ নয়।

এর প্রমাণ তারা ইতিমধ্যেই বহুবার দিয়েছে। জনগণের জন্য এই নির্বাচিত সংসদ ও সংসদীয় সরকার এখনো পর্যন্ত কিছু না করলেও এবং তার কোনো সম্ভাবনা দেখা না

গেলেও, জীবনকে আরও বেশি নিজেদের করার জন্য তারা বিগত কয়েক মাসের অধিবেশনগুলিতে অনেক কিছু করেছে। "অবৈধ" এরশাদ সরকার তৎকালীন সংসদ সদস্যদেরকে করমুক্ত মোটরগাড়ি কেনার সুযোগ দিয়েছিলো, যে সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা করেছিলো। এখনকার "বৈধ" সংসদীয় সরকার সংসদ সদস্যদের জন্য হাত খরচা বাবদ ধার্য করেছেন অতিরিক্ত বাৎসরিক পঁচাত্তর হাজার টাকা, ব্যবস্থা করেছেন ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের (লাল আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের), যা নিয়ে তাঁরা কাস্টমস-এর তোয়াক্কা না করে ইচ্ছে মতো জিনিসপত্র আমদানি রপ্তানি করতে পারবেন। এবং ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের অনেক বেতন বৃদ্ধির। তেলা মাথায় তৈল দেয়ার এইসব পদক্ষেপই হলো এই "গণতান্ত্রিক" সংসদীয় ব্যবস্থার আসল লক্ষ্য। সারা দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ যখন খাদ্যাভাব, অপুষ্টি এবং চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাবে জর্জরিত, বেকারত্বের দরুন দিশেহারা, ঝড় তুফান বান বন্যার কবলে পতিত হয়ে যখন তাঁদের জীবন ছিন্নভিন্ন, তখন তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার নামে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে বসে ও "বৈধ" সরকার গঠন করে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের পাণ্ডা ব্যক্তিরা আরও বেশি করে আখের গুছিয়ে নিচ্ছে, জীবনকে আরও বেশি করে নিজেদের করবার জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এদিক দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং ক্ষমতা বহির্ভূত বিরোধীদলের লোকদের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য না থাকার কারণ সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকলেও বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় তারা সকলেই একইভাবে শাসক শ্রেণীরই লোক, তাদেরই প্রতিনিধি। এই ব্যবস্থায় জীবন যাদের এরা তাদেরই প্রতিনিধি।

'জীবন যাদের' এবং 'জীবন যাদের নয়' তাদের মধ্যেই আজ বাঙলাদেশে এক প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটছে নানাভাবে। এবং একে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী করার চক্রান্ত করছে তারা যারা সরাসরি শ্রমজীবী জনগণের শত্রু এবং তারাও, যারা সরাসরি শত্রু না হলেও প্রকৃতপক্ষে শত্রু, যাদের বোলচাল কাজ কারবার ও কৌশল খুব চালাকিপূর্ণ।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই সংগ্রাম চলছে এবং এর পরিণতিতে আজ 'জীবন যাদের নয়', ভবিষ্যতে জীবন যে তাদের হবে তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াতে কি ঘটছে তার দ্বারা এই জীবনযুদ্ধের পরিণতি নির্ধারিত হবে না। সেটা নির্ধারিত হবে সমাজ বিকাশের অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী, আমাদের দেশে উপরোক্ত দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব বিরোধিতা ও সংগ্রামে বিকাশেরই মাধ্যমে। এই জীবনযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করার পরই জীবন আজ যাদের নয় তারা বলতে পারবে, "জীবন আমাদেরই"।

আজকের কাগজ

১৫.১১.১৯৯২

বাঙলাদেশের মাই লাই : লোগাং হত্যাকাণ্ড

এ বছর মাত্র কয়েকদিন আগে, ১৯৯২-এর ১০ই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার লোগাং গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে শত শত পাহাড়ি, অধিকাংশই বৌদ্ধ চাকমা, নিহত হয়েছেন। নিহতের সংখ্যা ১৩ থেকে ১৩ শত পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে। এই সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয়ের কোন উপায় নেই। তবে ১৩ অথবা ১৩ শত কোনটাই না হলেও সেটা যে শত শত তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্রেও এই সংখ্যা ১৩৮ বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

একটি চাকমা যুবতী লোগাং গ্রামে পুনর্বাসিত বাঙালি মুসলমানের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত। যুবতীটি যখন কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলো সেই সময় কয়েকজন পুনর্বাসিত বাঙালি মুসলমান বা শরণার্থী তাকে ধর্ষণ করতে থাকার সময় সে কৃষিকাজে ব্যবহৃত তার হাতিয়ার দিয়ে তাদের একজনকে কুপিয়ে হত্যা করে। এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, আনসার বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং সেই সঙ্গে কিছু শরণার্থী একসঙ্গে সমগ্র এলাকার স্থানীয় অধিবাসীদের উপর সশস্ত্র হামলা করে। এই হামলার ফলে লোগাং গ্রামের শত শত ঘরবাড়িতে আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হয়, অসংখ্য পাহাড়ি নিহত এবং আহত হন। যাঁরা জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সব থেকে বড়ো উৎসব বৈ-সা-বী ১২ই এপ্রিল থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিলো। এই উপলক্ষে ঢাকা এবং অন্য এলাকা থেকে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতা ও কর্মী আমন্ত্রিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। ১০ই এপ্রিলের হত্যাকাণ্ড কিভাবে একটি বিরাট উৎসবকে স্তব্ধ করে দিয়ে সমগ্র এলাকার জনগণকে শোকাভিভূত ও বিক্ষুব্ধ করেছিলো তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরোক্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এক সংবাদপত্র বিবৃতির মাধ্যমে প্রদান করেছেন। সরকারও এর সত্যতা প্রথমে অস্বীকার করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এই হত্যাকাণ্ড স্বীকার করতে হয় এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিরুদ্ধ মতামত, এখনো ক্ষীণ হলেও যাতে জোরদার হয়ে উঠতে না পারে সে জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেক উর্ধ্বতন সরকারি ব্যক্তি এলাকা সফর করে পাহাড়িদের 'নিরাপত্তার' ব্যাপারে গালভরা আশ্বাস দেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও এলাকা পরিদর্শন করে পাহাড়িদের স্বপক্ষে কিছু কথা বলেন, কিন্তু এই ঘটনা তাঁদের মধ্যে যে বিশেষ কোন ক্রোধ অথবা প্রকৃত বিরোধিতার সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় এ সব বক্তব্যের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁদের বক্তব্য এক ধরনের সংযত নির্বাচনী প্রচারণার মতোই শোনায়। বাঙালি শোষক শ্রেণীর সরকারি ও বেসরকারি অংশের মধ্যে যে 'ভ্রাতৃপ্রতিম শত্রুতা' দেখা যায় এ

১০ই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের লোগাং-এ যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এবং চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি জাতিসত্তাসমূহের গুচ্ছগ্রামগুলি যেভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে

তার সঙ্গে তুলনা করা চলে ষাটের দশকের শেষ দিকে ভিয়েতনামের মাই লাই গ্রামে মার্কিন সামরিক আক্রমণের, যে আক্রমণের ফলে শত শত ভিয়েতনামী অল্প সময়ের মধ্যেই নিহত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন অসংখ্য এবং তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছিলো। সেই মার্কিন সামরিক বর্বরতার বিরুদ্ধে তখন সারা বিশ্বে এক তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার 'গণতন্ত্র' 'মানবিকতা', 'মানবিক মূল্যবোধ' ইত্যাদি যে সব বড়ো বড়ো বুলি জনগণকে 'উপহার' দিতো সেগুলি মাই লাই হত্যাকাণ্ডের ফলে সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে পরিণত হয়েছিলো এক হাস্যকর ভণ্ডামিতে।

সে সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামেও চালু করেছিলো 'গুচ্ছগ্রাম'। এক এক এলাকার মানুষকে গুচ্ছগ্রামের নামে এক ধরনের সামরিক ক্যাম্পে বন্দি অবস্থায় রেখে তাদের চলাফেরা, গতিবিধি সতর্কতা ও তীক্ষ্মতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে রাখাই ছিলো 'গুচ্ছগ্রাম' গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামী জনগণের সংগ্রামের মুখে খানখান হয়েছিলো, উচ্ছেদ হয়েছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত শত শত গুচ্ছগ্রাম। সেই গুচ্ছগ্রামের গণ্ডি ভেঙে ভিয়েতনামী জনগণ নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন এবং অর্জন করেছিলেন চূড়ান্ত বিজয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে শেখা গুচ্ছগ্রাম পদ্ধতি পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু যে পাহাড়িদের উপরই নিয়ন্ত্রণ রাখে তাই নয়। বাঙলাদেশের সমতলভূমি থেকে যে হাজার হাজার দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমজীবীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে তাদের একটা বড়ো অংশকেও বস্তুতপক্ষে আটক রাখা হয়েছে এই সব গুচ্ছগ্রামে। পাহাড়িরা এই গুচ্ছগ্রামের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে যেমন হাঁপিয়ে উঠেছেন তেমনি সমতলভূমির যে বাঙালি শরণার্থীরা গুচ্ছগ্রামে বাস করছেন তাঁরাও অনেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন এই নিয়ন্ত্রণের বদ্ধ আবহাওয়ায়।

১৯৭১ সাল থেকে যাঁরা বাঙলাদেশে একের পর এক ক্ষমতায় এসেছেন তাঁরা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের প্রতি উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে মোটামুটি একটি গণতান্ত্রিক নীতি-নির্ধারণ এবং অনুসরণ করতেন তাহলে আজ এই অঞ্চলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেটা হতো না। বাঙালিদের সঙ্গে তাদের কিছুটা পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদেরকে বাঙালিদের থেকে এতোটা বিচ্ছিন্নবোধ করতেন না। উপরন্তু একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য বাঙালিদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে সচেষ্ট থাকতেন।

বাঙলাদেশের শোষক শাসক শ্রেণী পার্বত্য চট্টগ্রামে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তার ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের কিছু সংখ্যক লোক আত্মরক্ষার জন্য ভারতে আশ্রয় নিচ্ছেন অথবা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বাঙলাদেশের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী শক্তিসমূহের দ্বারা

পরিচালিত ভারতীয় সরকার এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ি শরণার্থীদের দুর্দশা ও দূরবস্থাকে ব্যবহার করে যে ফায়দা ওঠাবার চেষ্টা করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে ভারত ফায়দা ওঠাবার চেষ্টা করছে, এই যুক্তিতে পাহাড়ি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামকে ভারতীয় দালাল বা এজেন্টদের কাজ বলে আখ্যায়িত করার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। এ দেশের শোষক শাসক শ্রেণী এবং তাদের 'গণতান্ত্রিক' সরকার এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যতদিন নীতি-নির্ধারণ করে চলবেন, ততদিন তাঁরা নিজেরাই এক ধরনের আত্মপ্রতারণার শিকার হবেন এবং পরিস্থিতিকে জটিলতর করবেন। এটাই ঘটছে এবং এই পরিস্থিতির কোন গণতান্ত্রিক সমাধান এঁদের পক্ষে দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

শান্তিবাহিনী যদি পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে চায় তাহলে সেটা হবে সেখানকার বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বার্থের বিরোধী এক চক্রান্ত। কারণ ভারত একটি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসেবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জাতি ও জাতিসত্তার প্রতি কি নীতি অবলম্বন করে চলেছে সেটা সকলেরই জানা। কাজেই তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

তাঁদের মুক্তির সম্ভাবনা তাঁদের নিজেদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যে, সমতল ভূমির শোষিত নির্যাতিত বাঙালি জনগণের ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করার মধ্যে। কারণ যে আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমি ও কাঠামোর মধ্যে আমরা বাস করছি সে ভিত্তিভূমি এবং কাঠামো পরিবর্তন ব্যতীত সমতল ভূমির বাঙালি ও পার্বত্য অঞ্চলের অবাঙালি জনগণের কোন মুক্তি নেই। তাঁদের উভয়ের ভাগ্যই একই সংগ্রামের উপর নির্ভরশীল, তাঁদের উভয়ের মুক্তির পথ এক এবং অভিন্ন।

৪. ৫. ১৯৯২

ভোরের কাগজ
১৯. ৫. ১৯৯২

পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় নিপীড়ন ও প্রতিরোধ আন্দোলন প্রসঙ্গে

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের ওপর যে ধরনের নিপীড়ন হচ্ছে এবং এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণ যে প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করছেন তার মধ্যে বিশেষত্ব তেমন কিছু নেই। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতাসীন হলে সব সময়ে তারা দুর্বলতর জাতি অথবা জাতিসমূহের ওপর যে নিপীড়ন চালায় সেই নিপীড়নই সেখানে চলছে। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের কথা বাদ দিয়ে যদি বাঙলাদেশ আমলের কথা বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, আওয়ামী-বাকশালীদের শাসন থেকে বর্তমান 'গণতান্ত্রিক' সরকারের শাসন পর্যন্ত এ পরিস্থিতির মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

হয়নি। তবে জাতিগত নিপীড়নের নীতি কার্যকর করতে গিয়ে সেই নিপীড়নের মাত্রা ও ব্যাপকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

এইভাবে নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হলে এক পর্যায়ে সামরিক বাহিনীকে নামাতেই হয়। এদিক দিয়েও এখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী বাকশালী আমলে পাহাড়ি জনগণের ওপর নিপীড়নের যে মূলনীতি ও লাইন উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রণীত ও নির্ধারিত হয়েছিলো সেই লাইনই ধারাবাহিকভাবে জিয়াউর রহমান, এরশাদ ও বর্তমান বিএনপি সরকারের দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শাসকদল ও সরকার বেসামরিক অথবা সামরিক, না স্বৈরতন্ত্রী অথবা গণতন্ত্রী এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ বাঙলাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যে সরকারই ক্ষমতাসীন হোক, যেভাবেই তারা ক্ষমতায় আসুক, তারা প্রত্যেকেই উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই প্রতিনিধি। এবং এই প্রতিনিধিত্বের কারণেই তারা অপরাপর দুর্বল ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ওপর তাদের নিপীড়ন অব্যাহত রাখে।

যে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এভাবে অন্য জাতি ও জাতিসত্তার ওপর শোষণ নিপীড়ন চালায় তাদের সম্পর্কে একটা ধারণা খুব স্পষ্ট থাকা দরকার। সে ধারণাটি হলো এই যে, এই উগ্র জাতীয়তাবাদীরা কখনো নিজেদের জাতিভুক্ত দরিদ্র শ্রেণীর, শ্রমজীবী জনগণের বন্ধু নয়। এরা নিজেদের জাতির বিপুল অধিকাংশ মানুষের, কৃষক শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মেহনতি মানুষের ওপরও কায়েম রাখে শোষণ নিপীড়নের রাজত্ব। বাঙলাদেশ এদিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রম নয়। কাজেই বাঙলাদেশের এই উগ্র জাতীয়তাবাদী শোষক শাসক শ্রেণীর একটি অংশ, ওপর তলার অংশ, তাদের শোষণ শাসনের দ্বারা লাভবান হলেও, তারা রাতারাতি মুনাফার পাহাড় বানিয়ে এবং নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে ধনসম্পদে স্ফীত হলেও বিপুল অধিকাংশ বাঙালি এই উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদেরই দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত।

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, যে জাতি অন্য কোন জাতির ওপর শোষণ নিপীড়ন চালায় সে জাতিভুক্ত জনগণ নিজেও স্বাধীন নয়। তারা নিজেরাও মূলত একই ধরনের শোষণ নিপীড়নের শিকার। এ কথার সত্যতা উপলব্ধির জন্য কোন বিশেষ জ্ঞান ও বিদ্যার প্রয়োজন হয় না।

পাহাড়ি জনগণের ওপর যে শোষণ নিপীড়ন আজ চলছে সে প্রসঙ্গে এ সব কথা বলার প্রয়োজন এ কারণেই যে, যে কোনো সংগ্রাম করতে দাঁড়িয়ে যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয় তার চরিত্র যদি সঠিকভাবে জানা না থাকে তাহলে সে সংগ্রাম কখনো প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারে না। উপরন্তু শত্রু মিত্র গুলিয়ে ফেলে বা একাকার করে সংগ্রাম বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়।

পাহাড়ি জনগণের ওপর যারা নিপীড়ন করছে, তাঁদেরকে জমিজমা ও বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করছে, তাঁদের জীবিকার পথ বন্ধ করছে, তাঁদের গৃহে অগ্নি সংযোগ ও

নারী ধর্ষণ করছে, স্বদেশ ভূমিতে পরবাসী করে রাখছে, সংস্কৃতির ওপর হামলা করছে, ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করছে তারা যে বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদী শোষক একথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি খুব ভালোভাবে ও সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো, নিপীড়নকারী এই উগ্র জাতীয়তাবাদী শোষকরা বাঙালি হলেও বাঙলাদেশের সকল বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদী অথবা শোষক নয়। উপরন্তু তাদের বিপুল অধিকাংশই হলো সাম্রাজ্যবাদী জাতীয় নিপীড়ন এবং দেশীয় সেই উগ্র জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শোষকদের শোষণের শিকার, যে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা পাহাড়ি জনগণের ওপরেও তাদের শোষণ নিপীড়ন জারি রেখেছে।

এ বিষয়টি খেয়াল রাখলে এই বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে যে, বাঙালি মাত্রেই পাহাড়ি জনগণের শত্রু। এই বিভ্রান্তির খপ্পরে পতিত হলে পাহাড়িদের স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম কখনো সঠিক পথে পরিচালিত হবে না, উপরন্তু সে সংগ্রামের পথে এমন সব বাধা অকারণে সৃষ্টি করা হবে যে বাধা অতিক্রম করা এক মহাকঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। প্রায় অসম্ভব।

এর কারণ, নিপীড়িত ও শোষিত বাঙালি জনগণের মধ্যে পাহাড়ি জনগণের প্রতি বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির অভাব নেই। পাহাড়িদের ওপর উগ্র জাতীয়তাবাদীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগণের মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আছে। এই বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ পাহাড়ি জনগণের অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে শক্তির এক বিরাট উৎস।

একথা জনগণের শত্রুরা জানে এবং পাহাড়ি ও সমতলভূমির জনগণের থেকে সাধারণভাবে অনেক বেশি জানে। এজন্যই তারা চেষ্টা করে শ্রমজীবী বাঙালিদের, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চেতনাসম্পন্ন বাঙালিদের থেকে পাহাড়ি জনগণকে বিচ্ছিন্ন করতে। এই ধরনের জনশত্রুরা পাহাড়িদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক থাকা স্বাভাবিক এবং তারা আছেও। তাদের একাংশকে বাঙালি উগ্র জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের দালাল হিসেবে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ব্যবহারও করে থাকে।

এতো গেল যারা দালালি করে তাদের কথা। কিন্তু যারা দালালি করে না, উপরন্তু পাহাড়ি জনগণের নিজেদের স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম করে তাদের একাংশও এই সংগ্রামে নিযুক্ত থেকে নিজেদেরকে জনগণের ব্যাপক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। এমনকি শত্রুভাবাপন্ন পর্যন্ত হয়ে পড়ে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, বাঙালি মাত্রেই পাহাড়ি জনগণের, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতি বা জাতিসত্তার শত্রু।

পাহাড়ি অঞ্চলের জুম্ম জনগণ ও সমতলভূমির বাঙালি জনগণের মধ্যে এই বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি করে তাকে কাজে লাগানোর একটি উপায় হিসেবে শাসক শ্রেণীর একে পর এক সরকার দীর্ঘদিন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালিদের বসতি স্থাপনের

উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বসতি স্থাপনকারিরা কারা? এরা কি বাঙালি ধনিক শ্রেণীর লোক, না এরা দরিদ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর, ভূমিহীন কর্মহীন বেকারদের একটি অংশ? এরা যে এই দ্বিতীয় ধরনের তাতে সন্দেহ নেই এবং একথা পাহাড়ি জনগণের, বিশেষতঃ পাহাড়ি জনগণের সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের জানা আছে।

এই দরিদ্র ভূমিহীন বাঙালিদেরকে পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে সরকার তাঁদেরকে জমি জমা দিচ্ছে। এ জমি কাদের? নিশ্চয় বাঙালিদের নয়। আসলে পাহাড়ি জনগণকে তাঁদের জমিজমা ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেই এই জমির ওপর দরিদ্র বাঙালিদের বসানো হচ্ছে।

এভাবে গরীবদেরকে জমিতে বসানোর পর উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া পাহাড়িরা যখন নিজেদের জমিজমা ফেরৎ পাওয়ার দাবি করছেন তখন সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরাও গরীব। কাজেই তাঁদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করলে তাঁরা যাবেন কোথায়? তাঁদের জীবিকার কি ব্যবস্থা হবে?

সরকার কর্তৃক যে বাঙালিদেরকে পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁদের জন্য জমির ব্যবস্থা করা, তাঁদের জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব জুম্ম জনগণের নয়। সে দায়িত্ব সরকারের। কাজেই দরিদ্র ভূমিহীন মানুষদের জন্য সরকার যদি এতই দরদ অনুভব করেন তাহলে সে ব্যবস্থা তাঁদের জন্য সমতল ভূমিতেই করা উচিৎ। সে ব্যবস্থা করা উচিৎ এই দরিদ্র ভূমিহীনদের নিজেদেরই গ্রামাঞ্চলে বড়ো জমি মালিকদের অন্তত কিছু জমি অধিগ্রহণ করে সেটা গরীবদের মধ্যে বন্টনের দ্বারা। এটাই হলো, এ সমস্যার সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক সমাধান।

কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কোনো সরকারই এ সমস্যা সমাধান এভাবে করতে চায় না। সেটা করার তাগিদ ও দায়িত্ব যদি তারা বোধ করতো তাহলে বাঙলাদেশে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমেই তারা সেটা করতে পারতো।

তারা এ কাজ করতে পারে না, কারণ এটা করলে শোষক শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত না করে তা করা যায় না। আর শোষক শ্রেণীর সরকার যে তার নিজের শ্রেণীর বিরুদ্ধে এভাবে যেতে পারে না একথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বোঝানোর কোন প্রয়োজন নেই।

কাজেই আসল যে কারণে গরীব ভূমিহীন বাঙালিদের জন্যে একের পর এক উগ্র জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সরকার কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাচ্ছে সেটা হলো, পাহাড়ি জনগণের সাথে বাঙালিদের একটা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিজেদের শোষণ শাসন ব্যবস্থাকে সেখানে নিরাপদ রাখা। পাহাড়ি জনগণকে শুধু সামরিক শাসনের মধ্যে রেখে তাঁদের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ খুব সহজ কাজ নয়। এজন্য বেসামরিক দরিদ্র মানুষদেরকেও তারা পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

যে ভূমিহীন দরিদ্র বাঙালিরা পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করছেন তাঁরা

প্রকৃতপক্ষে নিরুপায় হয়ে সেখানে যাচ্ছেন। বলা চলে যে তাঁদেরকেও তাঁদের গ্রাম ও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেই পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা খুব জোর দিয়েই বলা যাবে যে, সমতল ভূমির গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারি ভূমিহীন মানুষ, বেকার ও জীবিকার উপায়হীন মানুষ, যদি নিজের এলাকায় জীবিকার কোন সংস্থান করতে পারতেন তাহলে অপরিচিত এবং তাঁদের জন্য অসুবিধাজনক পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁরা যেতেন না। তাঁরা বাস্তবত সেখানে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বাঁচার তাগিদে। কিন্তু জীবিকার জন্য তাঁরা পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে পাহাড়িদের জীবিকার ব্যবস্থাকে অনিশ্চিত করছেন। নিজেদের বাঁচার তাগিদে সেখানে গিয়ে তাঁরা পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণের জীবন ধ্বংসের সরকারি চক্রান্তের কলকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন বা হতে বাধ্য হচ্ছেন।

শুধু সাধারণভাবে বাঙালিদের প্রতিই নয়, এই বসতিস্থাপনকারি বাঙালিদের প্রতিও পাহাড়ি জনগণের, সেখানকার স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের সংগ্রামে নিযুক্ত পাহাড়িদের কি দৃষ্টিভঙ্গি হবে সেটা তাঁদের সঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

গুরুত্বপূর্ণ এ কারণেই যে, এই বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদেরকেই সরকার পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। এইভাবে যাতে তারা এদেরকে ব্যবহার করতে, অন্তত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যাপারে পাহাড়িদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, নিজেদের জমি ফেরৎ পাওয়া, নিজেদের ভিটে মাটিতে আবার বসতি করার দাবি পাহাড়িদেরকে বর্জন করতে হবে। মোটেই তা নয়। যে বাঙালিদেরকে সেখানে বসতি স্থাপন করতে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে পাহাড়িদের জায়গা থেকে অবশ্যই সরে আসতে হবে। বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের অনেকেই বাস্তবত সরেও আসতে চান, কারণ সেখানে জমিজমা সামান্য পেলেও যে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তাঁদেরকেও জীবন কাটাতে হয়, যে অনভ্যস্ত পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সেটা তাঁদের পক্ষেও রীতিমতো এক কষ্টকর ব্যাপার।

কিন্তু কষ্টকর হলেও নিজেদের নোতুন পাওয়া পাহাড়ি এলাকার জমিজমা ছেড়ে আসাও তাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার, অনেকের পক্ষে অসম্ভব। কারণ জীবিকার কোনো বিকল্প সংস্থান তাঁদের নেই।

এই বিকল্প সংস্থানের দাবি পাহাড়ি জনগণ ও বাঙালি বসতি স্থাপনকারিদের মধ্যে আপাত বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐক্য ও সমঝোতার এক গণতান্ত্রিক ভিত্তি। এর দ্বারা একদিকে যেমন জমি ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়া পাহাড়িদের পক্ষে নিজেদের জমি ও ভিটেয় ফিরে আসা সম্ভব, তেমনি অন্যদিকে সম্ভব ভূমিহীন ও দরিদ্র বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের জন্য সমতলভূমিতে জমি অথবা কাজের ব্যবস্থা করে তাঁদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া পাহাড়িদের জমি ও ভিটেবাড়ি ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারটি এখন

বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের বিকল্প কর্মসংস্থান অথবা বিকল্প জমি প্রাপ্তির সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হয়ে গেছে। দরিদ্র ভূমিহীন বাঙালিদেরকে পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে এদেশের শোষক শাসক শ্রেণীর সরকারগুলিই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এই ভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতি এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক সাধারণ পরিস্থিতির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এ সমস্যা সমাধানের উপায় বাঙলাদেশে ব্যাপক ও মৌলিক ভূমি সংস্কার, যে সংস্কারের মাধ্যমে অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের মালিকানাধীন অতিরিক্ত জমি জাতীয়করণ করে সরকারের হাতে নিয়ে আসা যাবে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় বাঙলাদেশে শিল্প বিকাশের মাধ্যমে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। এই কাজ এ দেশের সাধারণ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত, এ আন্দোলনের বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত। এ আন্দোলন ও এই বিজয় তাই একদিকে যেমন বাঙলাদেশের সাধারণ শ্রমজীবীদের, তেমনি একইভাবে পাহাড়ি জনগণের। সমতলভূমির শ্রমজীবী বাঙালি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামী জীবনের এটাই হলো ঐক্যসূত্র। উভয়ের গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকারের সংগ্রাম, উভয়ের মুক্তি সংগ্রাম এভাবেই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এখন যে শুধু নিজেদের জমিজমা হারিয়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে দেশে বিদেশে অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে মানবেতর এবং অনিশ্চিত জীবন যাপন করছেন তাই নয়। যাঁরা ভিটে থেকে উচ্ছেদ হন নি, এখনো যাঁরা নিজেদের জমির ওপর থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন তাঁদের জীবনেও নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নেই। তাঁদের নারীদের ওপর নির্যাতন আছে। তাঁদের ওপর জারি আছে এক সামরিক শাসন যে শাসন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সরকার চাপিয়ে রেখেছে। তাছাড়া সাধারণভাবে জুম্ম জনগণের সংস্কৃতির ওপর নানাভাবে আক্রমণ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং এখনো অব্যাহত আছে।

এসবের বিরুদ্ধে পাহাড়ি জনগণ সংগ্রাম করছেন। এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা দরকার তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ ও আলোচনা করা হলো। তবে এক্ষেত্রে মূল যে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার সেটা হলো, উগ্রজাতীয়তাবাদী বাঙালিদের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে দাঁড়িয়ে নিজেরাও এক ধরনের উগ্রজাতীয়তাবাদীতে পরিণত না হওয়া। পাহাড়ি জনগণ যাতে ঠিক এই ফাঁদেই পতিত হন তার জন্য বাঙালি বুর্জোয়া শোষক শ্রেণী ও তাদের সরকার এবং সেই সাথে একাধিক বৈদেশিক শক্তি জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ চেষ্টা তাদের অব্যাহত থাকবে। কিন্তু পাহাড়ি জনগণের দেশীয় শত্রু এবং এক ধরনের বিদেশী বন্ধুদের এই চক্রান্ত পাহাড়ি জনগণকেই নিজেদের বিচার বিশ্লেষণ, সঠিক চিন্তা ও কর্মধারা এবং সঠিক সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রতিহত করতে হবে। তাঁদেরকে এ কাজে অন্যেরা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু এ সংগ্রাম মুলত তাঁদেরই সংগ্রাম। একে

সংগঠিত ও পারিচালিত করার দায়িত্ব তাঁদেরকেই সঠিক ও সুষ্ঠু চিন্তা এবং সতর্কতার সাথেই করতে হবে।

২৭.৯.১৯৯৩

বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত। বাংলাদেশ উপজাতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ। বান্দরবান পার্বত্য জেলা। অক্টোবর ১৯৯৩

সাক্ষাৎকার

"সশস্ত্র সংগ্রাম যদি ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত করে তাঁদের সমর্থনের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই সমর্থন করা দরকার"

[হিল লিটারেচার ফোরামের পক্ষ থেকে দুই সহকর্মী এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগের দিন টি.এস.সি.তে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী বদরুদ্দীন উমরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। *"রাডার"*- এ প্রকাশের জন্য সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব দিলে তিনি নির্দ্বিধায় সম্মতি দেন এবং পরের দিন হাটখোলাস্থ রোডে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানান। যথাসময়ে পর দিন অর্থাৎ ৩.৯.৯১ তার লিখিত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তিনি প্রশ্নগুলির উত্তর মুখে মুখে বলে যান এবং বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য ফিরোজ আহসান তা লিখে সাহায্য করেন। আটটি প্রশ্ন সম্বলিত তার সাক্ষাৎকার আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করলাম।]

রাডার : পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করুন। জুম্ম জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে কি আপনি ন্যায্য মনে করেন?

বদরুদ্দীন উমর : পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জুম্ম জনগণ যেহেতু বাঙালি নন এবং সেখানে কিছু সংখ্যক অন্যান্য জাতিসত্তার অধিবাসীরাই দীর্ঘ দিন ধরে সেই এলাকায় বসবাস করে আসছেন, তাঁদের ভাষাগত, সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে সেজন্য তাঁদের স্বায়ত্ব শাসনের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ন্যায়সঙ্গত বলেই আমরা মনে করি।

রাডার : বাঙলাদেশ সরকারের নিকট পেশকৃত জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবিনামা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাঁচ দফা দাবি সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি? যদি অবগত থাকেন তবে এ দাবিনামা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি।

ব. উ. : পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাঁচ দফা দাবির সাথে আমরা পরিচিত এবং এই দাবিগুলি সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক এবং সেজন্য এ দাবিগুলি সাধারণভাবে আমরা সমর্থন করি।

রাডার : পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

ব. উ. : সশস্ত্র আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলার সময় যেটা প্রাসঙ্গিকভাবে বিবেচনা করা দরকার সেটা হলো সেই সংগ্রাম জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি বিশেষ রূপ অথবা কোন ধরণের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কিনা। কারণ কোন জন বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক হতে পারে না। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম যদি ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত করে তাঁদের সমর্থনের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই সমর্থন করা দরকার। এবং এ ধরনের সংগ্রাম আমরা সমর্থন করে থাকি। এখানে আরেকটি বিষয়ে বিবেচনা অবশ্যই করা দরকার, যে, বিশ্বের কোন এলাকাতেই জনগণ প্রথমে অস্ত্রধারণ করেন না। তাঁরা অস্ত্রধারণ করেন এমন অবস্থায় যখন শোষক শাসক শ্রেণী তাঁদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে এবং অব্যাহত রাখে। একথা সকলেরই জানা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলিতে বাঙলাদেশ সেনাবাহিনীর বিশাল সামরিক উপস্থিতি রয়েছে। এই উপস্থিতির কারণ হিসাবে সেখানকার সশস্ত্র সংগ্রাম এবং তাকে দমন করার জন্য সরকারি প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আসল ব্যাপার যে সেটা হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। প্রথম থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হওয়ার ফলে সামরিক বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়নি! উপরন্তু সরকারি প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর নির্যাতন ও হামলা প্রতিরোধের জন্যই পাল্টা হিসেবে সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামের শর্ত সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এভাবে বিষয়টিকে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম যেভাবে চলছে সেটা সরকার যদি বন্ধ করতে চায় তাহলে যে কারণে এই সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্ভব সে কারণগুলি দূর করতে হবে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসনিক নির্যাতন বন্ধ এবং সামরিক বাহিনীর যে ধরনের উপস্থিতি রয়েছে সে উপস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে।

রাডার : বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার কতটুকু সমাধান সম্ভব?

ব. উ. : বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে অর্থাৎ বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলি বজায় রেখে বাঙলাদেশের কোন অঞ্চলেরই জনগণের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বিগত নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক সরকার নামে যে সরকারটি এখন ক্ষমতায় রয়েছে তাদের সঙ্গে এরশাদের সামরিক সরকারের যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্যই নেই সেটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে কারণ এরাও এরশাদের সামরিক শাসন আমলের আর্থ-সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই রাষ্ট্র যন্ত্রকেই ব্যবহার করছে। সমগ্র বাঙলাদেশের যখন এই অবস্থা তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে এঁদের থেকে সহজভাবে কিছু আশা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে সমগ্র বাঙলাদেশের জনগণের এবং তাঁদের একটি অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের হাতেও রাষ্ট্র ক্ষমতা আসা দরকার। এবং এর জন্য দরকার এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন।

রাডার : আপনার মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘুদের জাতীয় অস্তিত্ব কিভাবে সংরক্ষিত হতে পারে?

ব. উ. : পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি, আর্থিক জীবন, সামাজিক জীবন ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য তাঁদের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখেই সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

রাডার : পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পুনর্বাসিত বাঙালিদের প্রত্যাহার এবং তাদের কর্তৃক বেদখলকৃত জমি পাহাড়ি জনগণের নিকট ফেরত দেয়ার দাবি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

ব. উ. : রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেভাবে 'হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন ১৯০০' বাতিল করে অবাধে এবং কৃত্রিমভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকা বহির্ভূত লোকজনদের বসতি সেখানে স্থাপন করা হয়েছে তার দুটি দিক আছে। প্রথমত এবং মূলত এর উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসীদেরকে সংখ্যালঘুতে অথবা প্রায় সংখ্যালঘুতে পরিণত করা এবং তাঁদের উপর প্রথম দিকে পাকিস্তানি এবং ১৯৭১ সালের পর বাঙালিদের উগ্র জাতীয়তাবাদী আধিপত্য কায়েম করা। দ্বিতীয়ত এই কাজ করার উদ্দেশ্যে যাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে তাঁরাও হলেন বাঙলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের জমি থেকে উৎখাত হওয়া লোকজন। দারিদ্র্যের চাপে এরা জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র বসতি স্থাপনের মতো অবস্থায় পড়ার কারণেই সরকার কর্তৃক তাঁদেরকে ব্যবহার করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁদের বসতি স্থাপন করে তাঁদেরকে লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। এ বিষয়টি মনে রেখে একদিকে যেমন এ ধরনের বহিরাগত লোকদের অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে অন্যদিকে তেমনি ইতিমধ্যে পুনর্বাসিত যে সমস্ত বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে তাঁদের জন্য জমিজমা অথবা বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে তাঁদের অধিকাংশকেই সেখান থেকে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাডার : পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙলাদেশের বামপন্থী দলগুলোর কর্তব্য কি বলে আপনি মনে করেন?

ব. উ. : বাঙলাদেশের বামপন্থী নামে পরিচিত যে দলগুলি আছে তাঁদের কি কর্তব্য সেটা তাঁরাই জানেন। আমাদের ঠিক জানা নেই। তবে আমাদের কি কর্তব্য, আমাদের দেশে যে কোন গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী সংগঠনের কি কর্তব্য সে সম্পর্কে সংক্ষেপে শুধু এটুকুই এখানে বলা যেতে পারে যে, আমরা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের সাধারণ ও তাঁদের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অধিকার স্বীকার না করি এবং সেই দাবিগুলি অর্জনের সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান না করি তাহলে সারা বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী সংগ্রাম সঠিকভাবে সংগঠিত ও পরিচালনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর মূল কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও সমগ্র বাঙলাদেশের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেই হিসেবে বাঙলাদেশের জনগণের

প্রকৃতমুক্তির সংগ্রাম, শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তির সংগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রকৃত মুক্তির সংগ্রাম, তাঁদের শোষণ মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। বাঙালি উগ্রজাতীয়তাবাদের বশবর্তী হয়ে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করে তাঁদের উপর শোষণ নির্যাতন অব্যাহত রাখলে তাদের দ্বারা বাঙালি জনগণের মুক্তি অর্জন তো সম্ভবই নয়, এমনকি বাঙালি জনগণের নিম্নতম স্বার্থ রক্ষা করাও সম্ভব নয়। শেখ মুজিবের আওয়ামী-বাকশালী আমল থেকে খালেদা জিয়ার বর্তমান 'গণতান্ত্রিক' সরকারের আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের অনুসৃত নীতির মাধ্যমেই এই সত্যটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা মনে করি সাধারণভাবে বাঙালি জনগণেরও এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের দাবি দাওয়াকে নিজেদের গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়ার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখে তাঁদের দাবি দাওয়ার প্রতি সমর্থনের জন্য সোচ্চার হওয়া তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন।

রাডার : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের ঘোষণা ও কর্মসূচি কি?

ব. উ. : শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিষয়ই নয়, সামগ্রিকভাবে জাতিগত, ভাষাগত ইত্যাদি সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার ও সংগ্রাম সম্পর্কে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট প্রতিষ্ঠার সময় ৯ই জানুয়ারি ১৯৮৭ তারিখে ২০ দফা কর্মসূচির ১৯নং দফায় যা গৃহীত হয়েছিলো তা হল, "পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, পটুয়াখালী ইত্যাদি অঞ্চলে বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের উপর উগ্রজাতীয়তাবাদী শোষণ ও নির্যাতন প্রতিরোধ করা, তাঁদের স্ব স্ব জাতিসত্তা ও ভাষাগত বিকাশে সহায়তা করা।"

রাডার,

রাহুমুক্তি সংখ্যা

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

আনু মুহাম্মদ

বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং জাতিগত সমস্যা : পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের জনগণ অনেক রকম শাসনপদ্ধতি দেখেছেন, শাসকশ্রেণীর মধ্যেই বহুরকম রদবদল হয়েছে। অভূতপূর্ব জনপ্রিয় নেতার অধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এবং একদলীয় সরকার, জনপ্রিয় সামরিক শাসকের অধীনে সামরিক শাসন, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার, জনধিকৃত সামরিক শাসনের অধীনে সামরিক শাসন ও ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার, স্বৈরতন্ত্রবিরোধী দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একাধিকবার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ইত্যাদি। এত ধরনের সরকার ও শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে এত কম সময়ে, খুব কম দেশের জনগণেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে। জনগণ সম্ভবত এ শিক্ষাও লাভ করেছেন যে, শুধুমাত্র সরকার পদ্ধতি ও শাসক পরিবর্তনেই মৌলিক নীতির কোন পরিবর্তন হয় না। বস্তুত স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে বুর্জোয়াশ্রেণী যেভাবে সংহত ও বিকশিত হয়েছে তাতে শাসনপ্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাতে শাসকশ্রেণীর ধারাবাহিকতা ও মৌলিক ঐক্য বরঞ্চ আরো দৃঢ়তা লাভ করেছে। সে কারণে সরকার পরিবর্তনের ফলে নাম বা খোলসের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মৌলিক নীতিতে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থেকেছে। অন্যান্য আরও অনেক দিকের মত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সম্পর্কিত সরকারি নীতিতে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়।

বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার ঐতিহাসিক বিকাশধারা এবং এ সম্পর্কে শাসকশ্রেণীর বক্তব্য সংক্ষেপে পরীক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. জাতির অধিকার ও জাতীয় চেতনা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান অশান্ত ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি নিছক আইনশৃঙ্খলার ব্যাপার নয়, বা নয় নিছক কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির বিদ্রোহ ও তার দমনের ব্যাপার। বস্তুত এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে বসবাসরত প্রধান জনগোষ্ঠি বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্তার সদস্যরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিগত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার দাবি সরবে উচ্চারণ করেন প্রায় ২০ বছর আগে, এই উচ্চারণ ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনেক গোপন, প্রচ্ছন্ন, হিংস্র বিষয় স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। একটি অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হলেও ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে সকল জাতিগত সমস্যার সমাধান হয়নি। স্পষ্ট হয়েছে যে বাংলাদেশ শুধু বাঙালির রাষ্ট্র নয়, এদেশের নাগরিক অন্যান্য ভাষাভাষী, জাতি বা জাতিসত্তাও রয়েছে। এই নির্মম সত্যের মুখোমুখিও আমরা দাঁড়িয়েছি যে, একটি নিপীড়িত জাতি দীর্ঘদিন জাতিগত নিপীড়নের মধ্যে থেকে এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই এর অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ

হলেও তার শাসকশ্রেণীর কারণে নিপীড়ক জাতি হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু জাতি যতই সংখ্যাগুরু হোক না কেন, সংখ্যালঘু জাতি বা জাতিসত্তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যদি সেই জাতি বা জাতিসত্তা নিজের অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে একবার সচেতন হয়ে উঠে তাহলে সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা তাদেরকে দমন করা যায় না। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন বৃহৎ জাতির জাতিগত দম্ভ, আগ্রাসন পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে, বৃহৎ জাতির জনগণ তা থেকে ক্ষতিগ্রস্তই হন।

৩. জাতির আত্ম-উপলব্ধি

জাতি, জাতিসত্তা ও উপজাতি এই তিনটি নামে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির জাতিগত অবস্থান চিহ্নিত করার রেওয়াজ আছে। নৃতাত্ত্বিক বিভিন্ন বর্গে বিভক্তির সঙ্গে সবসময় এর মিল ঘটে না। একই নৃতাত্ত্বিকবর্গে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। নৃতাত্ত্বিকবর্গ নির্ণয় করা হয় জনগোষ্ঠির প্রাথমিক গঠন, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক বিকাশধারা ইত্যাদির ভিত্তিতে। অন্যদিকে জাতির উদ্ভবের সংগে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব সরাসরি সম্পর্কিত যদিও একটি জাতি একাধিক রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকতে পারে, আবার একটি রাষ্ট্রে দুই বা বহুজাতির সহাবস্থান সম্ভব। তবে জাতি হয়ে ওঠার সঙ্গে রাষ্ট্রের ভূমিকার সম্পর্ক আছে। জাতিসত্তা বলতে সে রকম জনগোষ্ঠিকে বোঝানো হয়, যেটি জাতি হিসেবে বিকশিত হবার সম্ভাবনা ধারণ করে কিন্তু এখনও বিকশিত হয়ে উঠেনি। আর উপজাতি হচ্ছে আরও নিম্নপর্যায়ের স্তরে অবস্থানরত জনগোষ্ঠি, যেটি আদৌ জাতি হয়ে উঠবে এ সম্ভাবনা কম। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, উপজাতীয় সমাজ বলতে সাধারণত প্রাক-পুঁজিবাদী এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠিকে বোঝানো হয়। এ সব বিবেচনায় বাংলাদেশে বাঙালি একটি বিকশিত জাতি গোষ্ঠি এবং বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জনগোষ্ঠি ভিন্ন ভিন্ন জাতির অংশ। এদেরকে সাধারণত উপজাতি বলে আখ্যায়িত করা হলেও 'জাতিগত সংখ্যালঘু'ই এদের নির্দেশ করার জন্য যথার্থ। তাছাড়া 'উপজাতি' শব্দটি ঔপনিবেশিক শাসকরা যেভাবে ব্যবহার করেছে তাতে এঁদের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়।[১] আর এতে এসব জাতিগোষ্ঠিকে "মানুষ বানানো", "আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক" ও "সভ্য" করে তোলার নামে জাতিগত শাসন নিপীড়নকেও বৈধতাদানের চেষ্টা দেখা যায়। আধুনিকায়ন এবং আধুনিক রাষ্ট্রগঠন এখানে সামরিকীকরণ ও সংখ্যালঘুদের দমন ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করলে বাংলাদেশ আপাতঃদৃষ্টিতে একটি একক জাতির বাসভূমি, এখানে মোট জনগোষ্ঠির শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ বাঙালি। শতকরা ১ ভাগ অন্যান্য জাতি বা জাতিসত্তার বাস, যাদের মধ্যে আছেন চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, গারো, ত্রিপুরা ও অন্যান্য। বাংলাদেশের জনসংখ্যায় এর শতকরা অনুপাত ১ হলেও সংখ্যায় মোটেও কম নয়- ১১ লাখ। এদের জাতিগত ভিন্ন অস্তিত্ব সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নয়, রাজনৈতিকভাবে এদের অস্তিত্ব টের পাওয়ার মত ঘটনা ৭২ এর আগে কমই ঘটেছে।

ব্রিটিশদের শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে চাকমা রাজাদের বিদ্রোহ, একই সময়কালে সাঁওতালদের বিদ্রোহ এর উল্লেখ্য ব্যতিক্রম।

স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতি ও জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের নিজেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সচেতনতা সৃষ্টি হয় যখন সংখ্যাগুরু জাতি বাঙালিদের বাসভূমি হিসাবে বাংলাদেশ গড়ে উঠতে থাকে। মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা, চাকমা জাতির সদস্য হলেও তিনি বস্তুত সকল জাতির মানুষেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন এ কারণে যে, তিনিই প্রথম এদেশে ভিন্ন জাতির অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার সম্পর্কে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই এই বিষয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক জোরালো দাবি উত্থাপিত হয়। বাঙালি শাসকশ্রেণী এসব দাবি উত্থাপনে প্রথমে ভ্রুকুটি করেছে, তারপর বিরক্তি প্রকাশ করেছে, এরপর দেখিয়েছে ভয়, তারপর ক্রুদ্ধ, হিংস্র হয়ে বৃহৎ শক্তি হিসাবে খুবই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর বেয়াদবি দমনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু সঙ্গতকারণেই সফল হতে পারেনি। পারেনি বলেই বাঙালি জাতির সদস্য হিসেবে আমরা গ্লানির সাগরে ডুবে যাইনি, তাদের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে আমরা এখনও বলতে পারছি বাঙালি শাসকশ্রেণী ও বাঙালি জনগণ সমার্থক নয়।

৪. ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

যেসব ঘটনা ধারাবাহিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আজকের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা ছিলেন স্বাধীন, অঞ্চলের উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। জুমচাষ, অব্যক্তিমালিকানা ও বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন সময়ে সীমান্তে বাণিজ্য নিয়ে চাকমাদের সঙ্গে বাঙালিদের সংঘর্ষ হয়। অবশেষে চাকমা রাজা জাল্লাল খান চট্টগ্রামের মুঘল গভর্নরের সঙ্গে চুক্তিতে আসেন। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়ের পর একের পর এক এই অঞ্চলে হামলা পরিচালিত হয়। পরে চাকমা রাজা জান বকশ খাঁ ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করেন।[২]

২. এ সময়ে এই অঞ্চলের নাম ছিল কার্পাসমহল, তুলা উৎপাদনের জন্য এক সময়ে খাজনা হিসাবে তুলার পরিবর্তে নগদ অর্থ দেয়ার প্রথা চালু হয়। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ১৮৬০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করেনি।

৩. সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যক্ষ রূপ নেয় এবং ১৮৬০ সালে কার্পাসমহলকে একটি জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। নাম হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম। জেলা প্রশাসক হিসাবে একজন ব্রিটিশ দায়িত্ব নেন। চাকমা, বোমাং ও মং রাজার উপর আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

৪. ১৯০০ সালের এ্যাক্টে এ অঞ্চলের প্রশাসনকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়, যে আইন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়নি, আবার পুরাপুরি কার্যকরও নেই। এই

এ্যাক্ট অনুযায়ী পুরো জেলাকে তিনটি প্রশাসনিক ও রাজস্ব সার্কেলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে চাকমা, বোমাং ও মং রাজাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রতিটি সার্কেলকে আবার তালুকে ও প্রতিটি তালুককে আবার মৌজায় ভাগ করা হয়। তালুক ও মৌজার দায়িত্ব দেয়া হয় যথাক্রমে দেওয়ান ও হেডম্যানদের।

৫. এই এ্যাক্ট অনুযায়ী অঞ্চলে বহিরাগতদের বিনানুমতিতে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। অঞ্চলটিকে উপজাতীয় অঞ্চল হিসাবেই ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে এই বিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং এর ফলে বহিরাগতদের প্রবেশ বাড়তে থাকে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, সমতলভূমির অধিবাসীদের প্রবেশ তখন তেমন কোন জটিলতা সৃষ্টি করেনি।

৬. ১৯৩৭ সালে পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনের সকল দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং রাজার অবস্থান নির্ধারণ করা হয় উপদেষ্টা হিসাবে।

৭. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই আইন অনুযায়ী অঞ্চলের শাসন চলতে থাকে। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ জেলার মর্যাদা পেলেও অঞ্চলের জনগণের কোন ভোটাধিকার ছিল না। ১৯৫৫ সাল থেকেই এ জেলাকে একটি সাধারণ জেলায় পরিবর্তনের চেষ্টা নেয়া হয় এবং ১৯৬৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা হয়।

৮. আর এই সময়েই এ অঞ্চলের জনগণের জীবন-জীবিকা ও অঞ্চলের সামগ্রিক পরিবেশের উপর, সে সময় পর্যন্ত, আরেকটি বড় আঘাত আসে। পাহাড়ি জনগণের নেতৃবৃন্দের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইউ এস এইডের ঋণের টাকায় ৫ বছর ধরে রাঙামাটিতে বাস্তবায়ন করা হয় কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প। এতে এ অঞ্চলের মোট আবাদি জমির শতকরা ৪০ ভাগ (প্রায় ৫৫ হাজার একর জমি) সহ ২৫০ বর্গমাইল অঞ্চল পানিতে ডুবে যায়। এ প্রকল্পের ফলে প্রায় এক লাখ চাকমা ও অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ (শতকরা প্রায় ২০ ভাগ) এতে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। এঁদের মধ্যে ৬০ হাজার কোনরকম ক্ষতিপূরণ পাননি। ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ছিল ৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার, দেয়া হয় মাত্র ২৫ লাখ ডলার। অঞ্চলে জুমচাষের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, হাজার হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে অঞ্চল ত্যাগ করেন। এ প্রকল্প পুরো এলাকায় একটি ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করে। এর পরপরই ১৯৬৬ সাল থেকে পরিকল্পিতভাবে বাঙালি পুনর্বাসন শুরু হয়। একদিকে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও অন্যদিকে পরিবেশগত হামলা সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে চরম অস্তিত্বের সংকটের মুখে নিক্ষেপ করে।[৩]

৯. ৬০ দশকে যখন একের পর এক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি এ অঞ্চলের পাহাড়ি *জাতিসত্তাসমূহের* উপর হামলা চালাচ্ছে ঠিক সে সময় বাঙালি জনগণ জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই অনেক সংগঠিত করেছেন, সারাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সে সময় ক্রমে জোরদার হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাঙালি ডান-বাম রাজনৈতিক ধারার কোনটাই পাহাড়ি জনগণের উপর একের পর এক হামলার বিরুদ্ধে

উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ করেনি, তাদের জাতিগত অধিকারের ইস্যুকে নিজেদের আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করেনি। ঐ অঞ্চলে পাহাড়িদের ক্রমান্বয় নিরাপত্তাহীনতার মুখে বাঙালি প্রবেশ, বাঙালি পাহাড়ি দ্বন্দ্বের কিছু কিছু সূচনা করে ঐ সময়েই।

১০. ১৯৭১ সালে রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানিদের পক্ষ অবলম্বন করেন, অন্যদিকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১১. পাহাড়িদের মধ্যে ক্ষুদ্র হলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব, বাঙালি জাতির বিজয় ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা পাহাড়ি জাতিগুলোর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য চেতনার বিস্তার ঘটায়। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার কারণে তারা আশাবাদীও হয়ে ওঠেন। এসব জাতিগোষ্ঠির মধ্যে আগেও কিছু কিছু সংগঠিত হবার চেষ্টা দেখা গেলেও লারমার নেতৃত্বেই তাদের প্রথম কার্যকর উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

১২. বাংলাদেশের সংবিধান চূড়ান্ত করবার প্রাক্কালে লারমা ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন এবং ৪টি দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক) পার্বত্য চট্টাগ্রামের স্বায়ত্তশাসন ও তার নিজস্ব আইন ব্যবস্থা।

খ) বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন বলবৎ রাখা।

গ) ট্রাইবাল চিফ এর অফিস অব্যাহত রাখা এবং

ঘ) অউপজাতীয় জনগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং আইন সংশোধন পথ বন্ধ করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ। লারমা প্রত্যাখ্যাত হন শুধু এ দাবিগুলোর জন্যই নয়। জাতি হিসাবে তাঁদের আলাদা অস্তিত্বই অস্বীকৃত হয়। এর পরপরই গঠিত হয় "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" যার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এসব জাতিগোষ্ঠির স্বতন্ত্র রাজনৈতিক *সত্তার* স্ফূরণ ঘটে।

১৩. ১৯৭৩ সালে লারমা স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন। তিনি সংসদেও পাহাড়ি জনগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিষয়টি উত্থাপন করেন। কিন্তু এসব কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। এ বছরই পার্বত্যঅঞ্চলে নিরাপত্তার নামে প্রথম সামরিক ক্যাম্প বসানো হয়। একই বছর শান্তিবাহিনী গঠিত হয়।

১৪. ১৯৭৫ এর পর সামরিক শাসন শুরুর পর পাহাড়ি জনগণের প্রতি রাজনৈতিক অস্বীকৃতি, সামরিক নিপীড়ন দমন এর রূপ নেয়। শান্তিবাহিনীর তৎপরতাও শুরু ব্যাপকভাবে।

১৫. সরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দরিদ্র বাঙালিদের অর্থ ও জমির লোভ দেখিয়ে এ অঞ্চলে পুনর্বাসিত করবার কাজও এসময়ে ব্যাপকভাবে শুরু হয়। পরবর্তীকালে কয়েক একর জমি ও ৩৬০০ টাকা দিয়ে ১৯৮০ সালেই সমতলভূমি থেকে ১ লাখ বাঙালি পরিবার আনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর আগে ১৯৭৯ সালে নেয়া হয় ৩০ হাজার পরিবার। ১৯৬০ সালে যেখানে বাঙালি জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ সেখানে ১৯৮৭ সাল নাগাদ তা শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়িয়ে যায়।[৪]

১৬. দুই দশকে বিশেষত ১৯৭৯ এর পর থেকে পার্বত্য অঞ্চলে উত্তেজনা, রক্তপাত অনেক বৃদ্ধি পায়। সামরিক বাহিনী মুখ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয়। সামরিক অভিযান, নিরীহ মানুষ হত্যা, নারী নির্যাতন, ধর্মীয় স্থানে হামলা, বিভিন্নরকম বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে সংখ্যালঘু এসব জাতিগোষ্ঠিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরের অভিযোগ ক্রমে বাড়তে থাকে।[৫]

১৭. কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ ও পরবর্তীকালে আবাদি জমির তুলনায় অধিকহারে জনবসতি স্থাপন, পাহাড় কেটে অবাধ কাঠের ব্যবসা, সামরিক ঘাঁটি নিরাপদ করবার জন্য পাহাড় পরিস্কার, বনায়নের বিকল্প ব্যবস্থা না করে বন পরিস্কার করে রাস্তা তৈরি ইত্যাদির ফলে পরিবেশ দিনে দিনে আরো বেশি হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।[৬]

১৮. এ অঞ্চলে সামরিক কার্যক্রম চালানোর জন্য বছর বছর ব্যয় বাড়তে থাকে। এ সম্পর্কে কোন হিসাব সংসদে না দেয়া হলেও সংসদ সদস্যদের মতে এই ব্যয় দিনপ্রতি কোটি টাকার বেশি হবে। বলা বাহুল্য এ টাকা বাঙালি জনগণের করের অর্থ থেকেই যায়। সংসদীয় পদ্ধতির শাসন প্রবর্তিত হলেও এ ব্যাপারে সংসদের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি। উপরন্তু সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা তোলার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে।[৭]

১৯. বিভিন্ন সময় 'শান্তি আলোচনা' চললেও তা বেশি দূর কখনোই অগ্রসর হয়নি। পাহাড়ি অঞ্চলে উন্নয়ন গুচ্ছগ্রামে রেশন ইত্যাদি বাবদ বিপুল অর্থব্যয়, কাঠের ব্যবসা, জমি বা পাহাড় দখল ইত্যাদি কেন্দ্র করে গড়ে উঠা সুবিধাভোগী মহল এ সমস্যা জিইয়ে রাখতে আগ্রহী বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক বিবেচনাও এর পশ্চাতে কাজ করছে।

২০. যে বাঙালিদের পার্বত্যঅঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং যারা আগে থেকে সেখানে আছেন তারা সম্মিলিতভাবে এখন ৫ লাখের মত। এদের বিপুল অধিকাংশ বস্তুত ক্যান্টনমেন্টের চারধারে গুচ্ছগ্রামে বসবাস করেন, কার্যত এরা ব্যবহৃত হন ঢাল হিসাবে। কর্মসংস্থানের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা সবকিছু মিলিয়ে এরা এক মানবেতর জীবনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। সুযোগ পেলে এদের বেশিরভাগই এ অঞ্চল ত্যাগ করতে আগ্রহী। অন্যদিকে এদের খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ প্রশাসনের সংগে সম্পর্কিতভাবে কাজ করে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার অংশীদারে পরিণত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের বাঙালিরাই এখন একটি সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়েছেন।

২১. ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলা পরিষদ পাহাড়ি জনগণ গ্রহণ করেননি। এরশাদ পতনের পর অন্যান্য জেলা পরিষদ বাতিল করালেও এগুলি অব্যাহত রাখা হয়েছে। জেলা পরিষদের অস্তিত্ব থাকলেও মোট ২২টি দায়িত্বের মধ্যে জেলা পরিষদ প্রথমে ৩টি ও পরে ৯টি দায়িত্ব পালনের এখতিয়ার পেয়েছে। বাকিগুলো এখনো স্থগিত। বেসামরিক প্রশাসন এখনও প্রত্যক্ষভাবেই সামরিক প্রশাসনের অধীনস্থ।[৮]

২২. সর্বশেষ পরিস্থিতি হল, সরকার প্রশাসনিকভাবে সংসদ সদস্যদের নিয়ে (সংসদীয় নয়) একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি জনসংহতি সমিতির সংগে আলোচনা শুরু করেছে। কমিটির গঠনপ্রণালী ও ক্ষমতা এবং এ অঞ্চলে গড়ে উঠা জাতীয় আন্তর্জাতিক সুবিধাভোগী গোষ্ঠির প্রভাব বিবেচনা করে এটা ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত যে, এই প্রক্রিয়ায় কোন স্থায়ী সমাধান হবে না। তবে যেটি হওয়া সম্ভব, সেটা হচ্ছে অস্থায়ী কোন সমাধান ও আপোষ। এতে করে হয়ত নতুন কিছু দ্বন্দ্বের উদ্ভব হবে।

৫. শাসক শ্রেণীর যুক্তি ও বাস্তবতা

পার্বত্যঅঞ্চলে অব্যাহত অঘোষিত সামরিক শাসন, বাঙালি বসতি স্থাপন, বাঙালি পাহাড়ি দ্বন্দ্ব, গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা, নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদির পেছনে সরকার নির্বিশেষে শাসকগোষ্ঠি ও তাদের অংশীদার বাঙালি এলিটদের কাছ থেকে যেসব যুক্তি শোনা যায় সেগুলো হল :

১. জনসংখ্যা অনুপাতে পার্বত্য অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মানুষ-জমি অনুপাত অনেক কম।

২. পার্বত্যঅঞ্চলে অন্যান্য এলাকা থেকে বাঙালি এনে বসতি স্থাপন করানোতে কোন সমস্যা নেই, কেননা একই দেশের যে কোন অঞ্চলে যে কোন মানুষের যাবার অধিকার আছে।

৩. এ অঞ্চলে 'উপজাতি'রা শান্তিবাহিনী করে সশস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছে, বাঙালিদের নিরাপত্তা ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত করছে, সে জন্যই এ অঞ্চলে সামরিক প্রশাসন রাখতে হচ্ছে।

৪. এ অঞ্চলের 'উপজাতি'গুলো ভারতের দালাল এবং ৭১ এর রাজাকার। কাজেই এদের দমন করা প্রয়োজন।

৫. অঞ্চলে পরিবশে ধ্বংস নয়, উন্নয়ন তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

৬. দেশের সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা ও বাঙালিদের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী এই অঞ্চলে কাজ করছে।

পার্বত্যঅঞ্চলে মানুষ-জমি অনুপাত সমতলভূমির তুলনায় অনেক কম, এ যুক্তির সমর্থনে বলা হয়, পার্বত্য ৩টি জেলার আয়তন বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ১০ ভাগ কিন্তু জনসংখ্যা শতকরা মাত্র ১ ভাগ। অর্থাৎ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে মাথাপিছু জমি ১০ গুণ বেশি। আপাতঃদৃষ্টিতে কথাটি সত্য, কিন্তু এ বক্তব্যের মধ্যে পাহাড়ের সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে সম্পর্কিত কিছু জাতির স্বতন্ত্র কৃষিপদ্ধতি, জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি যেমন ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা আছে তেমনি পার্বত্যভূমি ও সমতলভূমির মাথাপিছু জমির পার্থক্য সম্পর্কে আছে অজ্ঞতা। পুরো পার্বত্যঅঞ্চলে জমির আয়তন প্রায় ৩০ লাখ একর। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদদের হিসাব অনুযায়ী এর মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ জমি এখানে শুধুমাত্র পাহাড়ের জন্যই উপযুক্ত, শতকরা ১৫ ভাগ জমি ফলবাগানের জন্য এবং শতকরা ৩ ভাগ জমি কৃষি আবাদের জন্য উপযুক্ত। কাপ্তাই বাঁধের কারণে

আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ ডুবে যাবার ফলে এ অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়। এখন মোটামুটি ১ লাখ একর জমি কৃষি আবাদের জন্য ব্যবহারযোগ্য। বাঙালি-পাহাড়ি মিলে এখন প্রায় দেড় লাখ পরিবার আছে। তাহলে পরিবার প্রতি কৃষিজমি ০.৭ একর, ৫ জনের পরিবার ধরলে মাথাপিছু জমি হয় ০.১৪ একর। বাংলাদেশে সমতলভূমিতে মোট আবাদী জমি ২ কোটি একরের কিছু উপরে। পরিবার সংখ্যাও ২ কোটির সামান্য বেশি। সে হিসেবে গড়পড়তা পরিবারপিছু আবাদী জমি আছে এক একর, ৫ জনের পরিবার ধরলে মাথাপিছু ০.২০ একর। তার মানে পার্বত্যঅঞ্চলে মাথাপিছু জমি বেশি হলেও আবাদী জমি কম। আগে পার্বত্যঅঞ্চলে জনসংখ্যা কম ছিল, নির্দিষ্ট জমিতে স্থায়ীভাবে চাষাবাদের ব্যবস্থাও ছিল, জুমচাষ ছিল এখানে প্রচলিত ব্যবস্থা। একেকটি পাহাড়ে বিরতি দরকার হত ৭ বছর। এখন জনসংখ্যাবৃদ্ধি, ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা, অঞ্চল ত্যাগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ইত্যাদি কারণে এ প্রথা প্রায় বিলুপ্তির পথে।[৯]

সরকার নয়া বসতিস্থাপনকারী বাঙালি পরিবারকে আড়াই একর ধানী জমি, ৫ একর পাহাড়ি জমি ও ৪ একর ঢালু জমি দেবার যে কথা বলেছেন, তা বাস্তবায়ন করতে গেলে নিশ্চিতভাবে সমস্ত পাহাড়ি পরিবারকে আবাদি জমি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং তারপরও সব বাঙালি পরিবারকে জমি দেয়া সম্ভব হবে না। অর্থাৎ জাতিবিদ্বেষী নীতির পূর্ণবাস্তবায়ন করবার পরেও অধিকাংশ বাঙালি পরিবার শিকার হবে প্রতারণার।

বসতি স্থাপনের অধিকার

দেশের সর্বত্র সকল নাগরিকের যাবার এবং বসতিস্থাপনের অধিকার আছে, এ অঞ্চলে বাঙালি বসতিস্থাপনের পেছনে এ যুক্তিটি দেয়া হয়। যুক্তিটি ঠিক, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে বাঙালি বসতিস্থাপনের সঙ্গে সকল অঞ্চলে সকল নাগরিকের গমনাগমন ও বসিতস্থাপনের অধিকারের পার্থক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এ পার্থক্য এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। বস্তুত পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে প্রতারণা, নির্যাতন, লুটপাট, জাতিগতবিদ্বেষ, বর্ণবাদী আগ্রাসন ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার। জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, অধিকার, ধারবাহিকতা ইত্যাদির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই যদি বিষয়টি বিবেচনা করা যায় তাহলে এটি বুঝতে আরও সুবিধা হবে। বিবেচনা করা যাক বাঙালি অধ্যুষিত একটি অঞ্চল, যেমন পাবনা। যমুনার ওপারে সিরাজগঞ্জ ও এপারে টাঙ্গাইল। দু অঞ্চলেই বাঙালি বসতি। কিন্তু যদি ঘটনা এরকম ঘটে যে, সিরাজগঞ্জের যত লোকসংখ্যা আছে ঠিক প্রায় একই সংখ্যক মানুষকে সেখানে জমি দেবার লোভ দেখিয়ে সরকারি ব্যবস্থায় টাঙ্গাইল থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত আছে, টাঙ্গাইলের সে মানুষদের দেয়া হচ্ছে নিয়মিত রেশন, প্রচার মাধ্যম ও শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের মানুষদের জীবন, জীবিকা, মতপ্রকাশ ও চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, তাদের প্রতি সবসময় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সন্দেহ, অবিশ্বাস। এরকম একটি পরিস্থিতি কি টাঙ্গাইলের মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নাকি

সিরাজগঞ্জের অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের জন্য টাঙ্গাইলের অধিবাসীদের ব্যবহার করা? এ রকম ঘটনা ঘটলে সিরাজগঞ্জের মানুষদের দিক থেকে অপরিহার্যভাবে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়। একই জাতির মধ্যে যখন এরকম ঘটনা ঘটে সেখানে সংখ্যালঘু *জাতিসত্তার* মানুষ প্রধান একটি অঞ্চলে সংখ্যাগুরু জাতির মানুষেরা যদি জোরপূর্বক গিয়ে ওঠেন, জমিজমা ব্যবসা, কর্মসংস্থানে যদি আধিপত্য বিস্তার করেন, রাষ্ট্রীয় আইন, প্রচার মাধ্যম, রাজনৈতিক দল ও সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র শক্তির সমর্থন নিয়ে যদি তারা চড়াও হন সংখ্যালঘুদের উপর তাহলে অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করে। জাতিগত বৈরিতা, অবিশ্বাস একটি স্থায়ী অবস্থায় পরিণত হবার দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে শাসকশ্রেণীই হুমকি সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সমাধানবিন্দু থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ অবস্থাই তৈরি হয়েছে।

রাজাকার বা ভারতের দালাল

এই পরিস্থিতিকে সমর্থন করা বা যুক্তিযুক্ত করার প্রচেষ্টা কোন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এবং এ চেষ্টা স্ববিরোধী বা আত্মঘাতীও হতে বাধ্য। চাকমা–মারমা–ত্রিপুরা সকল জাতিসত্তাকে একযোগে একবার ভারতের দালাল আবার পাকিস্তানি রাজাকার বলা হয়। যা একই সঙ্গে দায়িত্বহীন ও অসত্য। ভারতের শাসকশ্রেণীর দালাল প্রতিবেশী ক্ষুদ্র এই বাংলাদেশে থাকা খুবই সম্ভব, আছেও। আছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই। এবং এই দালালদের সবচাইতে শক্তিশালী ভিত্তি হচ্ছে সরকারের মধ্যেই, শাসকশ্রেণীর মধ্যেই যে শাসকশ্রেণী এই ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে চায়। আবার এদের রাজাকার গালি দেয় যে শাসকশ্রেণী সে শ্রেণী বাঙালি রাজাকারদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বনিয়েছে, বাঙালি রাজাকারদের রক্ষা করার জন্য নিয়োজিত রেখেছে সর্বশক্তি। কাজেই এসব যুক্তির কোনটিই ধোপে টেকে না।

শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা যেমন কোন শান্তিকামী বাঙালির পছন্দ নয় তেমনি কোন শান্তিকামী পাহাড়িরও তা পছন্দ হবার কথা নয়। আর এটাও ঠিক যে, ভারতেই শান্তিবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র। ভারতের যে শাসকশ্রেণী সে দেশের কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, অন্ধ্র, তামিলনাড়ুসহ প্রায় সকল অঞ্চলে জাতিগত ও বর্ণগত নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে, সমস্যাগুলোর গণতান্ত্রিক সমাধানের পরিবর্তে সশস্ত্র পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে সেই ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি বাংলাদেশের পাহাড়ি জনগোষ্ঠির সমস্যার সমাধান চায় এটা ভাবারও কোন কারণ নেই। ভারতের শাসকশ্রেণী তার কৌশলগত কারণে যতদিন প্রয়োজন ততদিন এ অবস্থাকে ব্যবহার করবে। সম্ভবত এ উপলব্ধি পাহাড়ি জনগণেরও আছে, সেজন্য তারা এ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে ও বাংলাদেশের বাঙালিপ্রধান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার আগ্রহ ব্যক্ত করছেন বেশি। তাছাড়া শান্তিবাহিনীর গঠন ও অভিযান শুরুকে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে, ক্রিয়া বলা যায় না, বলতে হয় জাতিগত অস্তিত্বের অস্বীকৃতি ও আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া। এদের সংখ্যা এখন পর্যন্ত, সামরিক দফতরের হিসাব অনুযায়ী,

পাহাড়ি জনগোষ্ঠির শতকরা মাত্র ১ ভাগ–প্রায় ৫ হাজার। গত দুই দশকে এই শান্তিবাহিনীর দমনের নামেই এ অঞ্চলে বিপুল সামরিক শক্তি মোতায়েন করা হয়েছে। জনগণের করের অর্থ থেকে ব্যয় করা হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকা। নিহত হয়েছেন বহুসংখ্যক পাহাড়ি, বাঙালি ও সামরিক–আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য। প্রমাণিত হয়েছে, এ পথে জাতিগত সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা এমনকি "নিয়ে যাওয়া" নিরীহ বাঙালিদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

৮. সামরিক বাহিনীর ব্যবহার

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিকচেতনা গড়ে উঠবার আবহ তৈরি হয়েছিল তা স্বাধীনতার পর টিকতে পারেনি। নতুনভাবে শোষণমূলক ব্যবস্থা ও অগণতান্ত্রিক বিধিবিধান প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যে সামরিক বাহিনী পাকিস্তান রাষ্ট্রে একটি চরম গণবিচ্ছিন্ন গণবিরোধী কাঠামোতে বিকশিত হয়েছিল সেই সামরিক বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি সদস্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, জনগণের সঙ্গে থেকে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন। এ সময়েই সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়ী গণবিচ্ছিন্ন সামরিক বাহিনীর পাল্টা ধারণা বিকাশ লাভ করে। স্বাধীনতার পর এই ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অনেকের মধ্যে। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ যত স্পষ্টভাবে শোষণমূলক অগণতান্ত্রিক রূপ নিতে থাকে ততই সামরিক বাহিনীও আগের আকার ও চরিত্র পেতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ভেতর থেকেই প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু তা ছিল দুর্বল। মুক্তিযুদ্ধের জনগণের বাহিনী এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেই জনগণের বৈরী যন্ত্রের শরীকে পরিণত হয়েছে। এই পরিণত হবার প্রক্রিয়াতেই জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাহিনীকে এক পর্যায়ে জাতিগত নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর সকল শোষণমূলক রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণী নিজের শ্রেণীগত স্বার্থে অন্য জাতির উপর নিপীড়ন করেছে এবং তাকে বৈধতাদানের জন্য জাতীয় স্বার্থ হিসাবে প্রচার করেছে। একই কথা বলে এই শ্রেণী জনগণের করের অর্থে প্রতিপালিত সেনাবাহিনীকে জাতীয় স্বার্থ বা স্বাধীনতার নামে নিজ জাতির শ্রমজীবী জনগণের উপর যেমন আরোপ করেছে তেমনি করেছে সুযোগ থাকলে, অন্য জাতির উপর। বাংলাদেশে এ ঘটনাটিই ঘটেছে।[১০]

পাহাড়ি জনগণের উপর যাবতীয় নিপীড়ন ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাঙালি জনগণের স্বার্থে করা হচ্ছে এটিও একটি প্রতারণামূলক বক্তব্য। পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের নামে ঐ অঞ্চলে যে বাঙালিদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশেরই বাস্তবত কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের কোন সম্মানজনক ব্যবস্থা হয়নি। তারা সামরিক ক্যাম্পে ঘেরাও হয়ে গুচ্ছগ্রামে অবস্থান করছেন। পাহাড়ি অঞ্চলে অনভ্যস্ত এই বাঙালি জনগোষ্ঠির বেশির ভাগ বাস করছেন মানবেতর জীবনে, তাঁরা ভীষণভাবে নির্ভরশীল রেশনের উপর।

রেশনের নামে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা, সে সম্পর্কেও বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়।

প্রায় ৫ লাখ বাঙালির নিরাপত্তা ও স্বার্থের নামে বছরে যারা শত শত কোটি টাকা ব্যয় করছে, সেই শাসকশ্রেণীর বাকি ১০ কোটি বাঙালির উপর শোষণ-নির্যাতনে কোন কার্পণ্য দেখা যায় না। ৫ লাখ দরিদ্র অসহায় বাঙালিকে যে ব্যবহার করা হচ্ছে হাতিয়ার হিসাবে সেটা সেই বাঙালির করুণদশা থেকেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

৬. বস্তুগত পরিবর্তনের প্রবণতাসমূহ

পার্বত্য অঞ্চলে অ-বাঙালি বাংলাদেশী সংখ্যালঘু জাতিসমূহ বিশেষত ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে যে রকম অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের মধ্যে গেছে তাতে এ জাতিগোষ্ঠিগুলোর গঠন, চেতনা ও সামাজিক প্রবণতার মধ্যেও অনেক রকম পরিবর্তন হয়েছে।[১১] সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

ক) আগে যেখানে এসব সমাজে উৎপাদন উপকরণের উপর অব্যক্তিগত মালিকানাই ছিল প্রধান, এখন সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানাই প্রাধান্যে এসেছে।

খ) সামগ্রিক গোত্রীয় নেতৃত্বের প্রভাব ক্ষমতা খর্ব হয়েছে অনেক পরিমাণে, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়েছে।

গ) পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে এসব অর্থনীতির যোগাযোগ বেড়েছে, প্রাক-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নিয়মনীতি দৃষ্টিভঙ্গি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণে।

ঘ) কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ, বিপুল সংখ্যক বাঙালির বসতিস্থাপন ও সামরিক আগ্রাসনে অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখযোগ্য। জুমচাষ এখন বিলুপ্তির দিকে। অন্যদিকে মৎস্যচাষ, কারখানায় কাজ, রাবার ও ফলবাগান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত পেশা তৈরি হয়েছে, কিন্তু তাতে পাহাড়িদের অংশগ্রহণ খুব কম।

ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিদ্যুতায়ন অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন চরিত্র খর্ব করেছে।

চ) বিপুল সংখ্যক বাঙালির উপস্থিতি এখানে সমতলভূমির উৎপাদন পদ্ধতিকেও উপস্থিত করেছে। বাঙালি এখানে তার উৎপাদন পদ্ধতিও আরোপ করবার চেষ্টা করছে। সংস্কৃতি, অভ্যাস, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে।

ছ) সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠেছে, শ্রেণী-বিভাজনও নতুন রূপ নিতে যাচ্ছে।

৭. জনগণের গণতান্ত্রিক ঐক্য

পুঁজিবাদের আগ্রাসী বিস্তার এ অঞ্চলকে ভিন্নধাঁচে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে-এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই আগ্রাসন যে বর্বরতা ও জাতিবিদ্বেষকে হাজির করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধও বাস্তব এবং অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। বলা বাহুল্য যে, এই প্রতিরোধ পশ্চাৎপদ প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবাধীন হলে তা দুর্বল, ভঙ্গুর ও পরাজিত হতে বাধ্য। জাতি হিসাবে ভিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা, অগ্রসর প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্ব,

মূল্যবোধ ও রাজনীতি নিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এই জাতিগুলোর টিকে থাকা ও বিকশিত হওয়ার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তা কতটুকু পূরণ হবে তা বাঙালি জাতির প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ভূমিকার উপর যতটা নির্ভর করে তার থেকেও বেশি নির্ভর করে এসব জাতির পুরনো সমাজের ভাঙনের মধ্য দিয়ে উদ্ভুত নতুন সচেতন অগ্রসর শিক্ষিত অংশের ভূমিকার উপর।

সংখ্যালঘু বিভিন্ন জাতিসত্তা যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সেইসঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন তারা সকলে একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হননি। জাতি হিসাবে টিকে থাকা বা বিকশিত হবার মত শক্তিও সকলের এক রকম নয়। নির্মম হলেও সত্য যে, এ জাতিগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি ভিন্ন জাতি হিসাবে খুব বেশিদিন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। সংখ্যার স্বল্পতা, নিজস্ব ভাষা সাহিত্যের দুর্বলতা বা অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে ছোট ছোট অনেক গোষ্ঠি বড় কোন জাতিসত্তার সঙ্গে মিশে যাবে কিংবা বৃহত্তর বাঙালি জাতির মধ্যেই বিলীন হবে।

পার্বত্যঅঞ্চলে যে সব বড় জাতিসত্তা আছে তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'জুমচাষ' বর্তমান বাস্তবতায় আর কতদিন টিকতে পারবে বা টিকে থাকা যৌক্তিক সে সম্পর্কেও সন্দেহ করবার কারণ আছে। কিন্তু জীবিকার পরিবর্তন সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি জাতিসত্তা আছে যেগুলি জাতি হিসাবে বিকশিত হবার মত ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শক্তি ধারণ করে। কোনটি টিকবে আর কোনটি টিকবে না সে সিদ্ধান্ত কে নেবে? কোন চাষপদ্ধতি ভাল ও যুক্তিযুক্ত সে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বই বা কার? এই প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত জাতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। কোন জাতি বা জাতিসত্তার জনসংখ্যা যতই কম হোক তাদের নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, নিজস্ব স্বতন্ত্র জাতিগত অস্তিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্তের অধিকারও একমাত্র তাদেরই। অন্য কোন জাতি সে যত অগ্রসরই হোক, সে সিদ্ধান্ত তারা নিতে গেলেই তা সৃষ্টি করে জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং তা থেকেই সৃষ্টি হয় বৃহত্তর জাতির দিক থেকে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ।

বাংলাদেশে বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহ, গবেষক, বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব হতে হবে তাই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত করা যে, জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবার জন্যই অন্যান্য সকল জাতি ও *জাতিসত্তাসমূহের* প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি যাতে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে সে অধিকার নিশ্চিত করা বৃহৎ জাতি হিসাবে বাঙালিরই কর্তব্য। এবং এ জন্যই যে কোন সামরিক বলপ্রয়োগের নীতি, ভাষা, সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার নীতি, মূলধারায় সম্পৃক্ত করবার নামে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলার নীতি, তাদের সম্পর্কে বর্ণবাদী বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস ছড়ানোর নীতি ইত্যাদির বিরোধিতাও আমাদের দিক থেকেই প্রবলভাবে আসতে হবে।

একটি ভূখণ্ডে বৈচিত্রময় সংস্কৃতি, ভাষা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত বিকাশের মধ্য দিয়েই একটি সম্মিলিত উন্নত মানবসমাজ গড়া সম্ভব। বিশ্বব্যাপী সকল জাতিকে বৃহত্তর একক মানবজাতিতে নিয়ে আসার অপরিহার্য পূর্বশর্তই হচ্ছে সকল জাতির পূর্ণবিকাশ। পশ্চাৎপদ জাতির বিকাশের প্রক্রিয়াতেই জাতিগত বিচ্ছিন্নতা ভেঙে, বিকাশমান শ্রেণীতে ঐক্যের ভিত্তিতে সমগ্র মানবসমাজ অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. উপনিবেশিক শাসকদের "উপজাতি" ধারণা প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণী আলোচনার জন্য দেখুন : Prashanta Tripura: " The Colonial Foundation of Pahari Ethnicity". *The Journal of Social Studies*, 58, October, 1992.

২. দেখুন : Raja Devasish Roy: "The Erosion of Legal And Constitutional Safeguard of the Hill People of the Chittagong Hill Tracts in Bangladesh: An Historical Account". সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ১৯৯২

৩. এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন : Syed Azizul Ahsan & Bhunifra Chakma: "Problems of National Integration in Bangaldesh," *Asian Servey*, October, 1983. FMA Abul Barkat & Shamsul Huda: "Politcal Economic Essence of Ethnic conflicts in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh," *Social Science Review*, D.U. December 1988.

৪. Barkat এবং Huda, পূর্বোক্ত

৫. এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন : "Life is not Ours", Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, The Report of the CHT Commission, May 1991. এবং একই কমিশনের পরবর্তী রিপোর্ট March ১৯৯২

৬. দেখুন : Nahid Islam: 'Ethnicity and Environment in South Asia : The case of CHT' সেমিনার প্রবন্ধ, আগস্ট ১৯৯২

৭. সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন, মোশতাক আহমেদ চৌধুরী, দীপংকর তালুকদার ও কল্পরঞ্জন চাকমার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের আলোচনা, ১৯৯২। আরও দেখুন : আনু মুহাম্মদ : "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে সংসদে খোলাখুলি আলোচনা করতে বাধা কোথায়?" *'প্রিয় প্রজন্ম'*, জানুয়ারি ১৯৯২

৮. দেখুন : ফেরদৌস হোসেন : "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা", *আত্মপ্রতিকৃতি*, ঢাকা, ১৯৯১.

৯. Raja Devashish Roy : পূর্বোক্ত

১০. দেখুন : আনু মুহাম্মদ : "পার্বত্য জনগণ কি বাংলাদেশের নাগরিক?" *দিকচিহ্ন*, ১৯

জুলাই ১৯৯১। এ লেখার বিরুদ্ধে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক, একজন সামরিক কর্মকর্তা প্রতিবাদ লেখেন, যা এ পত্রিকাতেই ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। এর উত্তরে একই পত্রিকায় আরেকটি লেখা প্রকাশিত হয় ৫ অক্টোবর, আনু মুহাম্মদ : "পার্বত্য জনগণ কি বাংলাদেশের নাগরিক?—২"।

১১. এ বিষয়ে আরও তথ্য ও বিশ্লেষণের জন্য দেখুন : Aditya Kumar Dewan: Class & Ethnicity in the CHTs, Unpublished PHD thesis, McGill University, 1991.

রক্তাক্ত লোগাং

কিছুই দেখি না কিছুই শুনি না কিছুই বুঝি না

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতির বাইরে যেসব সংখ্যালঘু জাতিসত্তা আছে তাদের সম্পর্কে বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের নাক উঁচু ভাবটা কোন গোপন ব্যাপার নয়। এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হল—এসব জাতি হচ্ছে বর্বর, এই খায়-সেই খায়, চেহারা কি রকম, কোথায় থাকে গোছের ; আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হল – বৈচিত্রের জন্য এদের কিছু জিনিস রক্ষা করা দরকার, কিছু মুখস্ত "নাচ-নাচ", 'পোশাক' দিয়ে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর, ওরা 'উপজাতীয়'-কি-সব ভাষায় কথা বলে বেশ মজার ভাবভঙ্গি করে তবে এগুলো ধ্বংস হতে দেয়া ঠিক নয়-এ জাতীয় পিঠ চাপড়ানো ভাব।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বাঙালি মধ্যবিত্ত বেশ গর্ব অনুভব করে, নিজেকে উঁচু সভ্য জাতির একজন ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কখনো ধমক দিয়ে কখনো মার দিয়ে কখনও 'আদর' করে নিজেদের অবস্থানকে আরও পাকাপোক্ত করতে চায়। শত শত বছর বাঙালি এই দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়েছে—বিশেষত ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের এই নাক উঁচু ভাব তো লুকানো ব্যাপার ছিল না—গদগদ বাঙালি মধ্যবিত্তের কাঁধে ব্রিটিশ প্রভুর জোয়ালের দাগ এখনও খুব প্রিয় স্মৃতি। ইংরেজরা যেভাবে শুধু বাঙালি কেন ভারতীয়দের দেখতো, সেই একই দেখার যোগ্যতা বাঙালি অধিপতিরা অর্জন করতে পেরে মহাগর্বিত। এই যোগ্যতা আর কিছু নয় শাসক শ্রেণীর আসনে যাওয়া। বাঙালি শাসকশ্রেণী আরেকটি জাতির উপর চড়াও হয়ে, তাকে ঘৃণা করে, অসম্মান করে, হত্যা করে, ধর্ষণ করে, ঘর ছাড়া করে, অনুগ্রহ করে খুব গর্ব অনুভব করে।

তাদের উপর চড়াও হয়েছে বাঙালি শাসকশ্রেণী, যাদেরকে সভ্য কোন পূর্ণাঙ্গ জাতি বলেই সে স্বীকার করে না, তাদের কোন জাতীয় উৎসব থাকতে পারে, এটা সে কি করে স্বীকার করবে? কিন্তু স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবতার কিছু আসে যায় না। বাঙলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতি নিজেদের কোন জাতীয় উৎসব এখনও ঠিক করতে পারেনি, ভাষা আর ধর্মীয় পরিচয়ের দ্বন্দ্বে তাদের পরিচয় সঙ্কট এখনও কাটেনি। কিন্তু সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ তাদের জাতীয় উৎসব সম্পর্কে দ্বিধান্বিত নয়, দ্বিধান্বিত নয় নিজেদের পরিচয় নিয়েও।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বসবাস করেন তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি হচ্ছে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, উৎসব সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না — না জানায় আমাদের কোন লজ্জাও নেই, মাঝে মধ্যে একটু আধটু জেনে ওদের কৃতার্থ করবার ভঙ্গি করি। ওদের আবার উৎসব কি হবে? এ জন্য জাতীয় বেতার-টিভি ওদের জাতীয় উৎসব সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান তো দূরের কথা একটি ছোট খবরও দেয় না।

বস্তুত উৎসব করবার মত অবস্থায় ওরা এখন নেই। সারাক্ষণ মৃত্যু, উচ্ছেদ, নিপীড়ন ও ভয়ে ভীত মানুষদের পক্ষে কোন উৎসবের কথা চিন্তা করা মুশকিল। তবু যদি দেখা যায় এই অবস্থা বছরের পর বছর চলছে, তাহলে ঐ জনগোষ্ঠীর আর কিছু করবার থাকে না। তখন মৃত্যুর সঙ্গে উৎসবকে এক করে নিতে হয়, সচল জীবন দিয়ে অচল জনপদের প্রতি ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিতে হয়।

এ বছরও তাই উৎসবের প্রস্তুতি চলেছে। উৎসবের নাম বৈসাবি ; ত্রিপুরাদের বৈসুক, মারমাদের সাংগ্রাই এবং চাকমাদের বিজু - এক সঙ্গে বৈসাবি। শহুরে বাঙালিরা অভ্যস্ত না হলেও গ্রামাঞ্চলে চৈত্র শেষে এবং বৈশাখের শুরুতে যে উৎসবের আমেজ তৈরি হতো এবং এখনও কিছু কিছু হয় তা চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা জাতি - জাতীয় উৎসব হিসেবেই পালন করে। তাদের এই উৎসব তিনদিনব্যাপী- চৈত্রের শেষ দু'দিন এবং ১লা বৈশাখ। চাকমাদের বিজু উৎসবের প্রথমদিন ফুল বিজু, দ্বিতীয় দিন মুল বিজু, তৃতীয় দিন সামাজিক মিলন। এ সময়ে মেয়েরা ৩০ চৈত্রর ভোরে পাহাড়ি নদীতে ফুল দিয়ে উৎসব শুরু করে। নতুন জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ায় শিশুরা। স্থানে স্থানে পাহাড়ে ঢালে গান, নাচের অনুষ্ঠান হয়। বাড়িতে বাড়িতে খায় সকলে, নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে উৎসব শেষ হয়।

এ বছরও সে রকমই পরিকল্পনা হচ্ছিল। তিনদিন সব রক্তচক্ষু ভুলে থাকার প্রস্তুতি। কিন্তু হল না। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ নিয়ে যদিও বা উৎসবের আয়োজন করা যায় কিন্তু তাজা রক্তের উপর উৎসব করা যায় না।

উৎসব শুরুর ঠিক এক দিন আগে লোগাং-এ দরিদ্র বন্দি, নিরস্ত্র শত শত মানুষ নিহত হলেন। শিশু, নারী, বৃদ্ধ। তখন মধ্যাহ্ন। প্রচণ্ড দুপুর। ঘরে ক্লান্ত দুর্বল অসহায় মানুষেরা প্রহর গুণছে। হিংস্র আক্রমণ হল তখনই। খোলা ঘরে কিংবা ঘরে ছিটকিনি দিয়ে আগুন ধরানো হল। আগুন ধরালো যারা, যারা দা, বটি, লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা সবল; বরঞ্চ আগুন নেভানোর দায়িত্ব-দুর্বলকে রক্ষা করবার দায়িত্বের কথা বলেই তারা আছে। শত শত ক্ষুদ্র কুটির নিমেষে পুড়ে গেল, পুড়লো মানুষ। নারী-শিশু মাথা হাত পা পোড়া আধপোড়া দেখেছেন অনেকেই।

প্রিয়জন নিহত হলে কি কান্নার অধিকার থাকবে না? চিৎকার করে অভিযোগ জানানোর অধিকার থাকবে না? প্রিয়জন হারানোর বেদনা অন্যকে জানানোর অধিকার থাকবে না? বর্বরদের বিরুদ্ধে পুরো দেশকে জানানোর অধিকার থাকবে না?

না। থাকবে না। কিছুই বলা যাবে না, কাঁদা যাবে না। শিশুদের নিয়ে বাবা হাঁটে, মা মরে গেছে – কোথায় যাবে কি করবে কে জানে? সন্তানেরা হেঁটে বেড়ায় অনিশ্চিত– বাবা–মা দুজনই মরেছে।.... বর্বর ঘাতক বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়–তৃপ্তির ছাপ চোখে মুখে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করলাম। নিহতদের স্বজনেরা পালিয়ে বেড়ায়, একটু বসে কান্নার সাহস নেই। কেউ যেতে পারবে না তাদের কাছে।

তারাই যেতে পারবে পোড়া আধপোড়া জনপদে যারা ফিরে এসে বলবে "কিছুই হয়নি, জীবন যাত্রা স্বাভাবিক চলছে। ওরা খুব সুখে আছে।"

এই কণ্ঠ আমরা চিনি। এসব বর্বর ঘটনা ও যুক্তির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় অনেক দিনের। বাঙালি জনগণ শুধু এ তথ্যটুকু জানেন না, তাদের দোহাই দিয়ে তাদের স্বজাতি শাসকেরা একই রকম হায়েনার বর্বর থাবা চাপাচ্ছে অন্য জাতির উপর।

এ সবকিছুই ঘটছে, কিন্তু আমরা কিছুই দেখি না, কিছুই শুনি না, কিছুই বুঝি না।

শাসক শ্রেণীর বদৌলতে পত্রিকার পাতায় ও টিভি–বেতারে তৈরি খবর পরিবেশিত হয়, চিন্তা নেই—সব ঠিকঠাক। সন্তুষ্ট হবার মত খবর দেখেশুনে বাঙালি শিক্ষিতেরা তৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘুমাতে যায়। বর্ণবাদের শিকার বাঙালি নিজেই বর্ণবাদীতে পরিণত হয়।

পাহাড়ের কোলে কোলে রক্তপাত চলতে থাকে। ১৮.৪.৯২

ভোরের কাগজ ২৪.৪.১৯৯২

রাডার, লোগাং গণহত্যা সংখ্যা, ১লা জুন ১৯৯২

পার্বত্য অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের একটি অঞ্চল বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীকে বছরের পর বছর চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে রাখা হয়েছে, তাদেরকে পরিণত করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে—তাঁরা পরিণত হয়েছেন নিজ বাসভূমে পরবাসী। যখন তখন যেখানে সেখানে যাওয়া তাদের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। ঘর থেকে তারা বেরুতে পারেন না। সবসময় আতঙ্কে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তাদের বাস করতে হয়। যে কোন সময় তাদের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হতে পারে, নারীর উপর নেমে আসতে পারে আদিম নির্যাতন, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মুখে পড়তে পারেন যে কেউ। শত সহস্র বছর ধরে যে অঞ্চলে বাস সে অঞ্চলে তাদের ঘুরতে হয় পরিচয় পত্র নিয়ে, এ অঞ্চলের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। অঞ্চল দখল করে আছে যারা তারা আছে গায়ের জোরে, অস্ত্রের জোরে—তারাই নির্যাতক, আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, হত্যা গুম নৃশংস অত্যাচার তারাই করে থাকে। তাদের ভাষা বাংলা।

এই বাংলাভাষী—বাঙালি জাতিও ঠিক এরকমই নির্যাতন, বৈষম্য আর দখলদারদের নির্মম নিপীড়নের মধ্যে ছিলেন। বহুবছর। তাদের স্বাতন্ত্র্য নিজস্ব ভাষা–

সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশের সংগ্রাম বহু বছরের। এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হয়েছে বহু গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬০ দশকের আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৭১ এর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মত ঘটনা এ প্রক্রিয়াতেই সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলে এখন মনে হয় ১৯৭১ এর বাংলাদেশ দেখছি। অথচ এখানে দখলদারের ভূমিকায় তারা রয়েছেন যারা ১৯৭১ সালে নিজেরাই ছিলেন ঠিক এরকমই দখলদারের শিকার। ঠিক যে ধরনের নিপীড়ন, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি সংগ্রাম করেছেন ঠিক সেই একই ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন ও বৈষম্য সেই জাতির শাসক শ্রেণী সুযোগ পেয়ে অন্যান্য জাতির উপর পরিচালনা করবেন এটা মেনে নেয়া মুশকিল। কিন্তু সেটাই হচ্ছে।

যে কোন জাতির শাসক শ্রেণী জাতির সকল শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু শাসক-শোষকশ্রেণী সব সময়েই চেষ্টা করে তার শ্রেণীগত স্বার্থকে জনগণের স্বার্থ বলে প্রতিষ্ঠা করবার এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসক শ্রেণী বাঙালি গণহত্যায় এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়েছিল। এখন বাঙালি শাসক শ্রেণী চাকমা মারমাসহ পার্বত্য জনগণের উপর গণহত্যা ও নির্যাতনে এই কৌশল ব্যবহার করতে চেষ্টা করছে। সফলও হয়েছে এই অর্থে যে, এই জাতির অন্যান্য শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিসমূহ এই নারকীয় কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার মত কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেননি।

পার্বত্য অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে গেলে অতীতের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করতে হয়। সংক্ষেপে তা এরকম :

০ ব্রিটিশ-ভারত সরকার ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ননরেগুলেটেড জেলার মর্যাদা দেয়। 'বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী ভিন্ন কিছু সুবিধা লাভ করে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নামে তাদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। আইন পরিষদে গৃহিত আইন নয়, বাংলার গভর্নরের অফিস থেকেই সব আইন কানুন প্রণীত হয়।

০ পার্বত্য জনগণ প্রথম ভোটাধিকার লাভ করেন ১৯৫৪ সালে। ৫৬ সালের শাসনতন্ত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ জেলার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়।

০ পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণের উপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা যেমন আরও সংহতরূপ লাভ করে তেমনি পার্বত্য এলাকার জনগোষ্ঠীর উপরও নতুন মাত্রায় নিপীড়ন শুরু হয়।

০ কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হলে তৎকালীন রাঙামাটি মহকুমার বিস্তীর্ণ আবাদী সমতল জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা জানা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে পাহাড়ি জনগণকে আগে থেকে জানানো হয়নি। *ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ* -এর রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার ক্ষতিপূরণের মাত্রা ঘোষণা করেছিল ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু বাস্তবে দেয়া হয় ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

০ 'বহির্ভূত' এলাকার নিয়ম ভঙ্গ করে জবরদস্তিমূলক পুনর্বাসন শুরু হয় ৫০ দশকের প্রথম দিকে। ৬২ সালের শাসনতন্ত্রে 'বহির্ভূত এলাকা' তুলে দিয়ে 'উপজাতি এলাকা' বলে চিহ্নিত করা হয়। ৬৬ সালে বিপুল হারে পুনর্বাসন করানো হয়।

০ পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে 'পাকিস্তান বিরোধী' আখ্যায়িত করে এসব কাজ চালানো হয়, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর 'বাংলাদেশ বিরোধী' আখ্যায়িত করে নির্যাতন পরিচালনা করা হয়েছে।

০ পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন জেলায় গোপন সার্কুলার প্রেরণ, বাঙালি দরিদ্রদের আকর্ষণ করবার জন্য বিশেষ সুবিধাপ্রদান এবং পুনর্বাসনের সুবিধার নামে তাদের পক্ষে সামরিক শক্তি প্রয়োগ, বাঙালি দরিদ্রদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার, বিদেশী সাহায্য সংস্থাকে আমন্ত্রণ ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান হারে চলে আসছে।

০ ১৯৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জনসংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৮ হাজার, এর মধ্যে বাঙালি ছিলেন ১ লাখ ৫৬ হাজার। বর্তমানে মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮ লাখ। বর্ধিত প্রায় ৩ লাখের মধ্যে পার্বত্য জনগণের বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যা মাত্র ১ লাখ। বাকি সকলেই বাঙালি।

০ আওয়ামী আমলে এলাকায় 'শান্তি' নিশ্চিত করবার জন্য ৩টি ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করা হয় এবং সকলকে বাঙালি হবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। জাতিগতভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বাঙালি পুনর্বাসন পরিকল্পনা এরপর জোরদার হয়।

০ ৭৫ এর পর ক্যান্টনমেন্টের আয়তন ও তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়। এর পর থেকে ক্রমাগতভাবে সামরিক আগ্রাসন বিভিন্নমুখী অমানুষিক নির্যাতন, উচ্ছেদ, খুন ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়েছে। লংগদু হত্যাকাণ্ডের মতো বীভৎস ঘটনাও ঘটেছে।

অতীতের এই ধারাবাহিকতা বিচার করলে দেখা যাবে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে কখনোই তাদের জাতিগত মর্যাদা দেয়া হয়নি। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিকশিত হবার সুযোগ দেয়া হয়নি। বরঞ্চ একের পর এক আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নিরীহ মানুষদেরকে সন্ত্রস্ত, এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সারা দেশের কোটি কোটি বাঙালি দরিদ্র শ্রমজীবী জনগণের উপর এক দিকে নির্যাতন শোষণ বৃদ্ধি করা হয়েছে অন্যদিকে তাদের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশকে এ অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে এক অবৈরী দ্বন্দ্বকে বৈরী দ্বন্দ্বে পরিণত করা হয়েছে। পার্বত্য জনগণকে বাধ্য করা হয়েছে আপন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন। জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে এ অঞ্চলের জনগণকে বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকারে পরিণত করা হয়েছে।

শাসক শ্রেণীর প্রচার মাধ্যমে কখনোই এ অঞ্চলের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়নি। তাঁদের উপর নির্যাতন তাদের সমস্যা, জটিল সন্ত্রস্ত জীবন সম্পর্কে সাধারণ বাঙালি জনগণের কোন ধারণা নেই। তাঁদের উপর আগ্রাসন, হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন, উচ্ছেদ ইত্যাদির কোন খবর দেয়া হয় না বরঞ্চ তাঁদের প্রতিরোধকে অনেক অতিরঞ্জিত আকারে প্রকাশ করা হয়—দেখানো হয় বাঙালি বিরোধী কর্মযজ্ঞ হিসেবে।

এ অবস্থা আরও প্রকট হয় এদেশের বাঙালি বামপন্থী বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্বহীন ভূমিকার কারণে। বাঙালি জাত্যাভিমান এদের অনেককে প্রবলভাবে কাবু করে রাখে। যেজন্য বীভৎস নিপীড়ন বছরের পর বছর পরিচালিত হলেও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ শোনা যায় না। আওয়ামী লীগ আমলে সিপিবিসহ বামপন্থীদের একটি মহল অন্য এক জাতিকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা ও চাপের বিরোধিতা করেনি। এরপর প্রত্যক্ষ নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদের এবং অন্যান্য বাম শক্তিসমূহের অধিকাংশেরই উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা দেখা যায়নি।

তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেশে বাম শক্তিসমূহ বাঙালি জনগণের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি খুব দৃঢ়তা ও ধারবাহিকতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন এবং পার্বত্য অবাঙালি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামের ব্যাপারে নির্বিকার রয়েছেন বিষয়টি এরকম নয়। বাঙালি শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের ব্যাপারেও তাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শিক ও সাংগঠনিক লেজুড়বৃত্তিই সেখানে মুখ্য। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যাপারেও যে তাদের বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির লেজুড় বৃত্তি দেখা যাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বস্তুত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল প্রকার জাতিগত নিপীড়নের বিরোধিতা করা হচ্ছে অন্যতম কর্তব্য। এমনকি জাতিগত নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন যদি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ দ্বারাও পরিচালিত হয় তাহলেও লেনিনের ভাষায়, "প্রতিটি উৎপীড়িত জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে সাধারণ গণতান্ত্রিক একটা অন্তর্বস্তু আছে নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং এই অন্তর্বস্তুটাকেই আমরা অবধারিত সমর্থন করি ....।"

পার্বত্য অঞ্চলে প্রধান দুটি জাতি হচ্ছেন চাকমা এবং মারমা। এছাড়াও আছেন ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, রিয়াং, খুমি, চাক, মুরং, বনযোগী, পাংকো এবং লুসাই জাতির জনগোষ্ঠী। ধর্মীয় দিক থেকে এরা কেউ মুসলিম নন, এঁরা হলেন প্রধানত বৌদ্ধ, এরপর আছেন হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং প্রকৃতি পুজারী। রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর এরা বাঙালি এবং মুসলিম এই দুই আগ্রাসনেরই শিকার।

বস্তুত সকল জাতির জাতিগত বিকাশের সম্ভাবনা একরকম নয়। তবে জাতি হিসেবে তার বিকশিত হবার অধিকার জন্মগত। তাই এ অধিকার রক্ষার জন্য তার সংগ্রাম অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত।

আরেক দিক থেকে বিষয়টি দেখা যাবে, পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি পুনর্বাসন কি কোটি কোটি বাঙালি শ্রমজীবী জনগণের ক্ষুদ্র কোন অংশেরও জীবন জীবিকার সমস্যার সমাধান করতে পারে? পারে না। সেক্ষেত্রে বাঙালি স্বার্থের দিক থেকেও এর অপরিহার্যতা কি? শাসক শ্রেণীর দিকে থেকে এর অপরিহার্যতা শ্রমজীবী জনগণকে জাতিগত বৈরিতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে একটি কৃত্রিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা এবং নিজেদের যাবতীয় নিপীড়নমূলক কার্যক্রমকে বৈধ করবার মধ্যেই নিহিত।

বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ আজ যে সাম্রাজ্যবাদী স্বৈবতন্ত্রী পুঁজিবাদী শোষণ নিপীড়নের শিকার, পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ সেই একই শত্রুর দ্বারা আরও প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত। মনে রাখা দরকার যে, কোন জাতির বৃহদাংশের উপর যদি শোষণপীড়নমূলক ব্যবস্থা মূখ্য না হয় তাহলে সে জাতির শাসক শ্রেণী কখনোই অন্য জাতির উপর শোষণপীড়ন চালাতে পারে না। দুই অংশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি যে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত তা প্রতিষ্ঠা করা ও সে অনুযায়ী কর্মসূচি নির্ধারণ করা সংখ্যাগুরু বাঙালি প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রগতিশীল দৃঢ় ভূমিকা ছাড়া সম্ভব নয়।

১৩ এপ্রিল ১৯৯০

পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে সংসদে খোলাখুলি আলোচনায় বাধা কোথায়?

গত কিছু দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালি অধিবাসীদের ওপর শান্তিবাহিনীর হামলার একাধিক খবর প্রকাশিত হয়েছে। এসব খবর সরকারি প্রচার মাধ্যমে যে রকম ঢালাওভাবে প্রচার করা হয়েছে, তাতে এটা নিশ্চয়ই ধারণা করা যায় এসব হত্যাকাণ্ডে সরকারের সায় নেই। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা যায়, নির্বাচিত সংসদে বার বার পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনায় বাধা দান করছে খোদ সরকারই। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর বাঙালি নিধনই যদি প্রধান ঘটনা হয়ে থাকে এবং সরকার যদি তার প্রতিকারের জন্যই সেখানে বিপুল সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে থাকেন তাহলে এসব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে দিতে সরকার এত গররাজি কেন?

এটা কি এ কারণে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি শাসক শ্রেণী যে বর্বরতা চালাচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন তদন্ত কমিশন বলছে তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে? পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত করা ও যাবতীয় লুণ্ঠন-নিপীড়নের তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার ভয়েই কি সরকার এই অঞ্চলকে 'গণতান্ত্রিক' সংসদের আওতার বাইরে রাখতে চান? এরকম অবস্থায় সরকারের পরিবেশিত খবরে আমরা কিভাবে আস্থা রাখতে পারি?

শান্তিবাহিনীর আক্রমণে দরিদ্র বাঙালি নিহত হবার ঘটনার খবর যদি সত্যি হয় আমরা তীব্র নিন্দা করি। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা এই দরিদ্র বাঙালিরা সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টি করেছে যে বাঙালি শাসক শ্রেণী—বাংলাদেশের ১০ কোটি শ্রমজীবী বাঙালি তাদের দ্বারাও শাসিত শোষিত নিপীড়িত। দারিদ্র এবং অসহায়ত্বের সুযোগে তাদেরকে হাতের গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে তারা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানিয়ে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বানাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বন্দ্ব বাঙালির সঙ্গে চাকমা-ত্রিপুরাদের দ্বন্দ্ব নয়, মুসলিম জনগোষ্ঠির সঙ্গে অমুসলিমদের দ্বন্দ্ব নয় যেমনটি শাসক শ্রেণী দেখাতে চেষ্টা করছে। এ দ্বন্দ্ব হচ্ছে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিপীড়কদের দ্বন্দ্ব। বাংলাদেশের এই নিপীড়কদের ভাষা বাংলা নিপীড়িতদেরও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা

বাংলা এবং অন্যদের ভাষা চাকমা মারমা প্রভৃতি।

বলা হয়ে থাকে পার্বত্য জনগণ বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন চালাচ্ছে। কথাটি ঠিক নয়। পার্বত্য জনগণ এবং তাদের বিভিন্ন সংগঠন একথা বার বার বলেছেন, তারা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না, তারা বাংলাদেশের অখণ্ডতার মধ্যে নিজেদের নাগরিক অধিকার চান।

এই নাগরিক অধিকার তাদের কাছ থেকে বহু বছরে হরণ করা হয়েছে। বস্তুত এই আগ্রাসন শুরু হয় আইয়ুব খানের সময় থেকে। সে সময় তাদের বলা হতো 'ভারতের দালাল', স্বাধীনতার পর তাদেরকে 'পাকিস্তানের দালাল' বলে এ আগ্রাসন অব্যাহত রাখা হয়, এখন আবারো তাদেরকে অভিহিত করা হচ্ছে 'ভারতের দালাল' বলে। একই জনগোষ্ঠীকে একেক সময় একেক অজুহাতে আক্রমণ করা হচ্ছে। শুধু আক্রমণ নয়, তাদের জাতিগত ভিন্ন অস্তিত্বকে চুরমার করে দেয়া এবং এ অঞ্চলে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা চিরস্থায়ী করার জন্য বিপুল সংখ্যক দরিদ্র বাঙালিকে ওখানে পুনর্বাসন করা হয়েছে, পার্বত্য জনগণের জমির উপর অধিকার খর্ব করে সেখানে বাঙালিদের স্থায়ী করা হয়েছে ; তাদের রক্ষার নামে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক সামরিক শক্তি ; জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে ; নিজ বাসভূমিতে তাদেরকে বানানো হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ; সার্বক্ষণিকভাবে সন্ত্রস্ত সব বয়সের নারী পুরুষ ; আন্তর্জাতিক কমিশন এ এলাকায় যেসব নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করেছে সে অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা হচ্ছে '৭১-এর বাংলাদেশের মতোই। '৭১-এর বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ঠিক যে ভাষায় কথা বলতো বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী পার্বত্য জনগণ সম্পর্কে ঠিক একই ভাষায় কথা বলে।

জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতিগত অধিকারের জন্যে আন্দোলন, গণহত্যা ও তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যে বাঙালি জাতির সে জাতির সদস্যদের কি পার্বত্য জনগণের অনুভূতি, যন্ত্রণা বুঝতে খুব কষ্ট হবার কথা? কথা নয়। তবুও আমরা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করি, বাংলাদেশে বাঙালি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে বিশেষ কোন মনোযোগ দিতে অনিচ্ছুক। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত, ফ্রিডম পার্টি, জাতীয় পার্টির ভূমিকা এ ব্যাপারে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ ; কিন্তু যারা জনগণের মুক্তির কথা বলেন, জাতিগত নিপীড়নের কথা বলেন তারাও এ ব্যাপারে কতটা দায়িত্ববোধের পরিচয় দিচ্ছেন? তারা কি জানেন না যে, অন্য জাতির ওপর নিপীড়ন শৃঙ্খল রেখে কোন জাতি নিজে শৃঙ্খল মুক্ত হতে পারে না?

দু'টো যুক্তি খুব দেয়া হয়— প্রথমত, ভারত এ অঞ্চলে চক্রান্ত করছে এবং শান্তি বাহিনীকে মদদ দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশেরই অংশ, সুতরাং সেখানে বসতি গড়ার অধিকার বাঙালিদের মৌলিক অধিকার, কেন তারা তা পারবে না?

ভারত প্রতিবেশী একটি তুলনামূলকভাবে প্রবল বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসেবে আশেপাশের ক্ষুদ্র দেশগুলোর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার চেষ্টা করছে, এটা ঠিক। আশেপাশের সবগুলো দেশেই, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভূটান জনগণের

মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অন্যতম প্রতিবন্ধক। ভারতের এই ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে তার নিপীড়ক সামাজিক ব্যবস্থার কারণে—যে কারণে ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষও ক্ষুদ্র শাসক শোষক শ্রেণী দ্বারা নিপীড়িত। ভারত হিন্দু প্রধান বলে একে সাম্প্রদায়িক রং দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা তো মুসলিম প্রধান দেশ নয়—এসব দেশের জনগণও তো ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। ভারতের এই আধিপত্য সাম্রাজ্যবাদ-অনুমোদিত। সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক সংস্থা যেভাবে ভারতের মাধ্যমে আশেপাশের দেশে হস্ত সম্প্রসারণ করছে, তেমনি ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নানা সংস্থা এ অঞ্চলে কাজ করছে। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী এ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অবলম্বন। এজন্য আশপাশের দেশগুলোর উপর ভারতীয় আধিপত্য বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যেরই আরেক রূপ। সে কারণে এদেশে সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা যখন ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বলেন তখন তা খালি কলসির আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই হয় না। একই কারণে বাংলাদেশে 'ভারত বিরোধী' বলে পরিচিত-জিয়া-এরশাদ-খালেদার আমলে 'ভারতপন্থী' বলে পরিচিত শেখ মুজিব আমলের থেকে ভারতীয় আধিপত্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একই কারণে জামাতে ইসলামিও ভারতের শাসক শ্রেণীর কাছে ধর্ণা দিয়েছে। ভারতের শাসক শ্রেণীর আধিপত্য ও চক্রান্ত বিরোধী লড়াই তাই ভারতসহ আশপাশের সবগুলো দেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। জনগণের সচেতন শক্তিই দেশের অভ্যন্তরের শাসক ও দেশের বাইরের শাসক শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই এর কাজ এগিয়ে নিতে পারে।

বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী ভারতের ইস্যুকে ব্যবহার করেছে সবসময়, কিন্তু একে সাম্প্রদায়িক রং দিয়েছে—মূল ইস্যু আড়াল করার জন্য—একে ব্যবহার করেছে দেশের ভেতরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য। আমরা চাই, পরিষ্কারভাবে দাবি করি ভারতের চক্রান্ত শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন সারা বাংলাদেশ ঘিরেই থাকা সম্ভব-সংসদে এটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হোক জনগণের কাছে সব খোলাসা করে বলা হোক। এ চক্রান্তের অংশীদার বাঙালি শাসকদেরও আমরা চিনতে চাই। চিনতে চাই কারা এ ইস্যু বিক্রি করে সামরিকীকরণ বৈধ করতে চায় তাদের, কারা ভারতের শাসক শ্রেণীর সঙ্গে জোট বেঁধে ভারত বিরোধী শ্লোগান বিক্রি করে তাদের।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যেহেতু বাংলাদেশের একটি অঞ্চল, সেহেতু সব বাঙালিই সেখানে যেতে পারেন নিশ্চয়ই। আগে গেছেনও। অনেক বাঙালি সেখানে গেছেন, বসতি গড়েছেন, বিয়ে করেছেন। তারা মিশে গেছেন পার্বত্য জনগণের সঙ্গে, কোন সমস্যা হয়নি। সমাজের স্বাভাবিক নিয়মেই জনগোষ্ঠীর এই স্থানান্তর ঘটে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে তখনই যখন এই অঞ্চলে জোরপূর্বক বাঙালি বসতি গড়া হয়েছে, যখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নয় বিভিন্ন জেলা থেকে সরকারি উদ্যোগে ঘুষ দিয়ে লোভ দেখিয়ে অসহায় বাঙালিদের এখানে আনা হয়েছে কামানের গোলা হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। এরকম বলপূর্বক বসতি গড়ার কারণে এখানে পার্বত্য জনগণ উচ্ছেদ হয়েছেন—আক্রান্ত

হয়েছেন। তাদের মধ্যে অবিশ্বাস অনাস্থা অনিশ্চয়তার বোধ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু বলপূর্বক বসতি গড়াই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে যখন পুরো এলাকাকে সামরিক এলাকায় পরিণত করা হয়েছে—তখনই সমস্যা আরো জটিল হয়েছে। সুতরাং বাঙালি জনগণকে যা বলে বোঝানো হচ্ছে সবই হচ্ছে প্রতারণামূলক। বাঙালি শাসক শ্রেণীর এই প্রতারণা গত ২০ বছর ধরে চলে আসছে। এখন তাই বাঙালি নিপীড়িত জনগণকে যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের ওপর পার্বত্য অঞ্চলের অসহায় বাঙালি এবং অসহায় নিপীড়িত পার্বত্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাঙালি শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সংগ্রাম সংগঠিত করার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব যারা এড়িয়ে যাবে তারা যে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণেরও মিত্র নন, সংখ্যালঘু শাসক শোষকদের মিত্র, তা বলাই বাহুল্য।

প্রিয় প্রজন্ম,

২৬.১১.১৯৯২

বাংলাদেশ শুধু বাঙালির বাসভূমি নয়

বাংলাদেশ কেবলমাত্র বাঙালিদের বাসভূমি নয়। এদেশে জাতিগতভাবে বাঙালি নন, বাংলা ভাষা মাতৃভাষা নয় এবং শতসহস্র বছর ধরে এ অঞ্চলেই বসবাস করছেন, কোন কোন অঞ্চলে তারা বাঙালিদেরও আগে বসতি গড়েছেন, ভিন্ন সমাজ সংগঠন সংস্কৃতি নিয়ে ভিন্ন জগৎ তৈরি করেছেন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে তারা নিজেদের বাসভূমি হিসেবে বিশ্বাস করেন, এখানে তাদের শেকড় বাঙালিদের চাইতে কম গভীরে প্রোথিত নয়, এ রকম জনগোষ্ঠী আছেন একাধিক। তারাও বাঙালিদের মতই বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা জরুরী যে, তারা বাঙালি নন। এদের জাতিগত পরিচয় খুব অজানা নয়, এঁরা হচ্ছেন চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, মুরং ও অন্যান্য। এদের ইতিহাস আলাদা, সমাজ আলাদা, ভাষা আলাদা কিন্তু আমাদের সকলের রাষ্ট্রীয় পরিচয় অভিন্ন।

জনসংখ্যা অনুপাতে এরা খুবই ক্ষুদ্র, শতকরা ১ ভাগ। শতকরা ৯৯ ভাগের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাঙালি জাতির ভার, সে ভারের কারণে অন্যান্য জাতির হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা সবসময় থাকেই। কিন্তু এরপরও তাঁরা দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করছেন। জাতিগতভাবে বাঙালিও নিপীড়িত ছিলেন, বাঙালিও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সেজন্য সম্ভবত: নিম্নস্তরে একটি ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি জাতি থেকে শাসক শ্রেণী গঠিত হবার পর এবং বাংলাদেশকে একক জাতির বাসভূমি হিসাবে ধরে নিয়ে তা আরোপ করবার ফলেই বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এ যুক্তি একদিক থেকে খুব নিরীহ মনে হয়, যে দেশে শতকরা ৯৯ জন মানুষ বাঙালি সে দেশে অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' নামে আখ্যা দিয়ে কিছু করুণাবর্ষণ করা যেতে

পারে। কিন্তু তাদের জাতিগত মর্যাদার স্বীকৃতি, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের ভিন্নতা মেনে নেয়া এবং তাদের নিজ নিজ পরিচয় নিয়ে বিকশিত হবার অধিকার প্রদান অনাবশ্যক। কিন্তু এ যুক্তি নিরীহ নয়, চরম অগণতান্ত্রিক একটি দৃষ্টিভঙ্গিরই এটি বহিঃপ্রকাশ। প্রশ্নটি জনসংখ্যার নয়, দৃষ্টিভঙ্গির।

এ ধরনের যুক্তি, বলাই বাহুল্য শুধু অন্যান্য জাতি ও জাতিসত্তার প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করে না, একই সঙ্গে তা বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের লড়াই-আত্মসম্মানবোধ এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে আঘাত করে।

ইতিহাসে গত কয়েকশো বছর কলম্বাসের তথাকথিত 'আমেরিকা' আবিষ্কারের নামে অন্য জাতি-সংস্কৃতির উপর বর্বর আগ্রাসনের মাধ্যমে অঞ্চল দখল, উপনিবেশ স্থাপন, লুটপাটের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাকে পরবর্তীকালে মহিমান্বিত করা হয়েছে আধুনিকীকরণের নামে। সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের সভ্যতা শিক্ষা দেবার জন্য এই দমন-পীড়ন-দখল আবশ্যক। এ জন্য সব দখলকেই তারা আবিষ্কার নামে অভিহিত করে, সব হত্যাকাণ্ডকে তারা বলে সভ্যতা।

এসব বর্বর ঘটনার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদ বিস্তৃত হয়েছে, আধুনিকীকরণ আধিপত্য বিস্তার করেছে কিন্তু একই সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে অনেক জাতির প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ ইতিহাস। একদিকে যেমন পুঁজির আগ্রাসনে বিশ্বের জীববৈচিত্র ধ্বংস হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে আরেক ধরনের ভারসাম্যহীনতা এবং এই পুঁজিবাদী আধুনিকায়নকে আদর্শ হিসাবে ধরে নেয়ায় অনুন্নত বিশ্বে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ শিকার হচ্ছে আগ্রাসনের, অস্বীকৃতির এবং ধ্বংসযজ্ঞের।

বস্তুত মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত একদিকে যেমন সকল ব্যক্তির বিকাশ অন্যদিকে তেমনি সকল জাতি ও সংস্কৃতির বিকাশ। এই বিকাশ মানবজাতিকে বিভক্ত করে না, বৈচিত্রময় বিকশিত সকল জনগোষ্ঠিকে অভিন্ন সমতলে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে।

শ্রেণীর বৈষম্য যে বিভাজন ও দমন পীড়ন সৃষ্টি করে, সংখ্যাগুরু মানুষকে যেভাবে অমানবিক জীবনের দিকে ঠেলে দেয়, সেই বৈষম্যকে মহিমান্বিত করবার আদর্শই জাতি ধর্ম বর্ণ ও লিঙ্গগত বৈষম্যকে উস্কানি দেয় এবং মানুষের উপর মানুষের নিপীড়নকে প্রবল থেকে প্রবলতর করতে থাকে। মানুষের দুই ধরনের পরিচয় আছে। একটি পরিচয় সে লাভ করে জন্মসূত্রে বা পারিবারিকসূত্রে। এই পরিচয়ের উপর তার কোন হাত নেই, কোন দায়দায়িত্ব নেই, তার নিজের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা দ্বারা তার এই পরিচয় নির্ধারিত হয় না। এগুলি তার লিঙ্গ বর্ণ জাতি বা ধর্মীয় পরিচয় নির্দেশ করে। যে পরিচয়ের জন্য একজন ব্যক্তির কোন দায়দায়িত্ব নেই, সেই পরিচয়ের জন্য কোন ব্যক্তি যেমন অধিক কোন গুরুত্ব বা অধিকার পেতে পারে না তেমনি একই কারণে কোন ধরনের তিরস্কারও তার প্রাপ্য নয়। কিন্তু বর্ণগত, ধর্মীয় জাতিগত বা লিঙ্গীয় পরিচয়ে মানুষকে বিভক্ত ও সে অনুযায়ী নির্যাতন-নিপীড়ন বিস্তৃত করার ইতিহাস এ বিশ্বে বহু। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনেক দূর পর্যন্ত বিকাশ হবার পরও এ অবস্থা এখনও সারাবিশ্বে অব্যাহত

আছে। জন্মগত পরিচয়, নিজের নিয়ন্ত্রণহীন পরিচয়ের জন্য বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বিভিন্ন দেশে নানারকম বৈষম্য, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও অশ্রদ্ধার শিকার হচ্ছেন। কিন্তু এই পরিচয় মানুষকে প্রকৃতপক্ষে বিভক্ত করে না। বৈচিত্র দান করে। যে বৈচিত্র নিয়ে মানুষ ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজ গঠন করতে সক্ষম। দ্বিতীয় যে পরিচয় মানুষ নিজে অর্জন করে বা সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে যে পরিচয় তার উপর আরোপিত হয় সেই পরিচয় মানুষকে পেশাগত শ্রেণীগত অবস্থান দান করে। সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন, শিক্ষিত ও শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যহীন, ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে। এই পরিচয় পরিবর্তন যোগ্য এবং এই পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে যে বিভাজন তৈরি হয় তা মানুষকে নিপীড়ন–বৈষম্যমূলক–অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। সেজন্য এই বিভাজন বৈষম্য সৃষ্টিকারী পরিচয় মুছে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লড়াই মানুষের বহু দিনের। এই লড়াই শোষিত নিপীড়িত মানুষের শোষক নিপীড়কদের বিরুদ্ধে। এই লড়াই যত বিকশিত হয়, ততই মানুষ সমৃদ্ধ হয়, সমাজ তত বিকশিত হয়। কাজেই বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত যে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় আছে, সেগুলো আমাদের বৃহৎ ঐক্যকে কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত করে না। ঐক্যকে বাধাগ্রস্ত করে শ্রেণীগত বিভাজন। কিন্তু শাসক শ্রেণী শ্রেণীগত বিভাজনকে আড়াল করবার জন্য সব সময় হয় ধর্ম, না হয় অঞ্চল না হয় জাতিগত ভিন্নতাকে সামনে নিয়ে আসে, নিপীড়নের রাস্তা প্রশস্ত করে।

বাংলাদেশে আজ যে জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু বিভিন্ন জনগোষ্ঠি বসবাস করেন, তাঁদের ভিন্ন জাতিগত অস্তিত্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শর্ত। বাংলাদেশে যেহেতু বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতির জনসংখ্যা অনুপাতে খুব কম, সেহেতু এ শর্ত পূরণ অনেক দেশের তুলনায় অনেকখানি সুবিধাজনক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভিন্ন অস্তিত্বকে রাষ্ট্র সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের জাদুঘরের বিষয়বস্তুতে পরিণত করবার দৃষ্টিভঙ্গিই শাসক শ্রেণীর মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা ঐ জাতিগুলিকে ছোট করে না, ছোট করে বাঙালি জাতিকে, বাঙালি জাতির ক্ষুদ্র অংশ শাসক শ্রেণীর অগণতান্ত্রিক চরিত্রই তাতে স্পষ্ট হয়।

জাতিগত সমস্যার সমাধান, পুরোনো সভ্যতার ধারক বাহক এই জাতিগুলিকে বিকশিত হবার প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না করবার ফলে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। বছরের পর বছর নানা নিপীড়ন–দমন–পীড়নের ঘটনা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তিও একে ব্যবহার করে দুর্বল বাংলাদেশের উপর নানা চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

যে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের ধ্বংসযজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মায়াকান্না এখন অনুন্নত দেশ গুলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য খুব দেখা যায়। বাংলাদেশেও তাদের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। তাদের মায়াকান্না দেখে কেউ যদি বিভ্রান্ত হন বা মোহমুগ্ধ হন, তাহলে সমস্যার গভীর আবর্ত থেকে তাদের মুক্তিলাভের কোন আশা নেই। জাতি হিসেবে বিকাশ লাভ, মানুষ হিসাবে পূর্ণ অধিকার নিয়ে বাঁচা,

শোষণ ও নিপীড়নের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে সংখ্যালঘু নিপীড়িত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এর বিকল্প নেই।

আদিবাসী বর্ষ স্মরণিকা,

ডিসেম্বর ১৯৯৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ও মূল প্রশ্নসমূহ

'পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি' গঠিত হয় ১৯৯২ সালে। একই বছর আগস্ট মাসে প্রকাশিত কমিটির ঘোষণায় এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য যে দাবিগুলো আমরা উত্থাপন করেছিলাম সেগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এসব দাবির একটিও এখনও পূরণ হয়নি এবং বলাবাহুল্য বলপ্রয়োগ ও কালক্ষেপণের মাধ্যমে এই অঞ্চলে সমস্যাকে দিনদিন জটিল করা হচ্ছে। চার বছর আগে উত্থাপিত দাবিসমূহ সে কারণে এখনও একইভাবে প্রাসঙ্গিক। দাবিগুলো নিম্নরূপ :

১. পার্বত্যঅঞ্চলে এযাবতকালে সংঘঠিত ঘটনাসমূহ এবং সমস্যার উৎস অনুসন্ধান এবং তার সমাধানের জন্য জনগণকে ও সরকারকে পরামর্শদানের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন। এই কমিটিতে সংসদ সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, আইনজীবী, লেখক সাংবাদিক, পাহাড়ি জনগণের প্রতিনিধি থাকবেন। এঁরা ইতিপূর্বে গঠিত সমঝোতা কমিটির দায়িত্বও পালন করবেন। এযাবতকালের সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, নিপীড়ন, অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করে তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান ;

২. প্রশাসনকে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা, বর্তমান জেলা পরিষদ বাতিল করে এই অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু এবং নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। জনসংহতি সমিতির গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি দান। অন্যদিকে, শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ করা। ভারত থেকে পাহাড়ি শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা ;

৩. পাহাড়ি জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া জমি তাদের ফেরৎ দান। গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় যাবার ব্যবস্থা করা। এলাকায় শিল্পসহ অকৃষি খাতে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বনায়ন ধ্বংস রোধ করা এবং বনায়নের নামে পাহাড়িদের উচ্ছেদ বন্ধ করা ;

৪. পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালিদের বলপূর্বক পুনর্বাসন যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারায় তাদের যে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে এবং যে সরকারি ভর্তুকি দিতে হচ্ছে তার অবসানের জন্য প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ইচ্ছুকদের দখলকৃত পাহাড়িদের ভূমি থেকে সরিয়ে অকৃষি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ অঞ্চলে পাহাড়ি জনগণের ভূমিস্বত্ব ও কর্মসংস্থানের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান ;

৫. এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভিন্ন জাতিগত পরিচয় নিয়ে টিকে থাকার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান ও নিজ নিজ ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে যাতে তাঁরা গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিকাশ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৬. পাহাড়ি জনগণের প্রতি বিদ্বেষ, অসম্মান ও অশ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও বাঙালি জনগণের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক নৈকট্য সৃষ্টির জন্য পাঠ্যসূচিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা।

গত বছর ২ জুন জার্মান কালচারাল সেন্টার, ধানমণ্ডিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে দেশে প্রথম একটি জাতীয় সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, গবেষক, শিক্ষক প্রমুখ এতে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ভাগে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত বক্তব্য ও সুপারিশমালা সেমিনারে উপস্থিত করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বিস্তারিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। এই সুপারিশমালাও এখনও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান আলোচনার ভিত্তি হিসেবে আমরা এই সুপারিশমালাকে গ্রহণ করতে চাই।

এই সুপারিশ(দাবি) মালার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ :

১. সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে বিকাশের অধিকারের রাজনৈতিক সাংবিধানিক স্বীকৃতি দান।

২. এ যাবতকালের রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার ও আটককৃত পাহাড়ি রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তিদান ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা, হুলিয়া প্রত্যাহার।

৩। এযাবতকালে পার্বত্য অঞ্চলে সংঘটিত হত্যা, নির্যাতন, অপহরণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাবলি নিয়ে তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচার। স্বাধীনতার পর থেকে এই অঞ্চলে সংঘটিত এসব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন বরাদ্দ, খাতওয়ারি ব্যয়, ভূমি-পাহাড় দখল, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবেশ ধ্বংস ইত্যাদি ব্যাপারে শ্বেতপত্র প্রকাশ। তদন্ত ও শ্বেতপত্র তৈরির জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবীদের প্রতিনিধি নিয়ে এমন একটি জাতীয় কমিটি গঠন যা স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম।

৪. প্রশাসনকে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা ও পক্ষপাতহীন প্রশাসন চালু করা। বর্তমান জেলা পরিষদ বাতিল করা এবং এ অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।

৫. জনসংহতি সমিতিকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রকাশ্যে, অবাধে রাজনীতি করবার ব্যবস্থা গ্রহণ। এ অঞ্চলে সামরিক বাহিনী ও শান্তিবাহিনীর খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭. বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা।

৮. সরকারি উদ্যোগে বাঙালি বসতি স্থাপন বন্ধ করা। দরিদ্র বাঙালিদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করে তাদেরকে অন্যত্র যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে সসম্মানে পুনর্বাসন করা।

৯. পাহাড়ি শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০. অস্ত্রবিরতি ও আলোচনা অব্যাহত রাখা অর্থবহ করবার জন্য আলোচনা ঢাকায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং সকল রাজনৈতিক দলকে এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা।

১১. আগত নির্বাচনের আগে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্বাচনী ইশতেহারে প্রকাশ করা।

১২. পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধিবাসীদের জন্য শিক্ষা কোটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে জিওসির নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেয়া।

১৩. জোরপূর্বক শ্রম বন্ধ করবার লক্ষ্যে আইএলও সনদ অনুসরণ করা।

১৪. এই অঞ্চলে নারী নির্যাতন বন্ধ করবার জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তাসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সনদগুলো কার্যকরী করা।

১৫. লোগাং, নানিয়ার চর তদন্ত কমিশন রিপোর্টসহ পূর্বের সকল রিপোর্ট প্রকাশ করা।

১৬. (ক) সরকারি উদ্যোগে আগত অধিবাসীদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে পাহাড়িদের বেদখলকৃত জমি ছেড়ে অন্যত্র স্বেচ্ছামূলক পুনর্বাসন করা এবং তাদের সাথে চুক্তি করা যাতে তারা পার্বত্যাঞ্চলের জমির ব্যাপারে তাদের দাবি প্রত্যাহার করে।

(খ) উপরোক্ত পুনর্বাসনের পরও যদি স্বল্প সংখ্যক সরকারি অধিবাসী পার্বত্যাঞ্চলে থেকে যায় তবে তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাদের জমি অধিগ্রহণ করে পাহাড়ি মালিকদের ফেরত প্রদান।

(গ) ক ও খ সুপারিশ বাস্তবায়নের পরে পাহাড়িদেরকে দলিলসহ জমি প্রদান।

১৮. (ক) যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ শরণার্থীরা স্ব স্ব জায়গায় ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ বন্ধ রাখা।

(খ) পাহাড়ি জনগণের সাথে অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনা না করে ও তাদের সম্মতি ছাড়া সরকারি কোন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ না করা এবং এর সাথে সাথে বিনা ক্ষতিপূরণে সরকার কর্তৃক দখলকৃত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ জমি ফেরত প্রদান।

(গ) আন্তর্জাতিক শরণার্থীদের ন্যায় অভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের স্ব স্ব জায়গায় পুনর্বাসন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি প্রদান।

১৯. (ক) পাহাড়িদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

(খ) ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ও ইংরেজির সাথে সাথে পাহাড়িদের মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে হবে।

(গ) স্কুলের পাঠ্যবইসমূহে পাহাড়িদের ইতিহাস ও বীরগাঁথা লিপিবদ্ধ করবার জন্য জাতীয় পাঠ্যসূচি ও টেক্সটবুক বোর্ডকে উদ্যোগ নিতে হবে।

(ঘ) পাহাড়ি ভাষার উপাখ্যানসমূহ, কাব্য, পুরাণ, লোকগীতি ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১২ই জুন কল্পনা চাকমা অপহরণ হবার পর তার উদ্ধারের দাবিতে কমিটি একাধিক প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। এক পর্যায়ে কমিটির উদ্যোগে স্পীকারের কাছে এক স্মারকলিপি দেয়া হয়। ২৫ জুলাই প্রদত্ত স্মারকলিপিতে কল্পনা চাকমার উদ্ধার ও এর সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয়। একই সঙ্গে কল্পনা চাকমার অপহরণের প্রতিবাদে আহুত সড়ক অবরোধ চলাকালে গুলি করে রূপন চাকমাকে হত্যা ও আরও তিনজন নিখোঁজ হবার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিও দাবি করা হয়। স্মারকলিপিতে আরও যে দাবিগুলো উল্লেখ করা হয় সেগুলো হল – * পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। * পার্বত্য অঞ্চলে সকল নারী পুরুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। * অবিলম্বে পার্বত্য অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করতে হবে। * অবিলম্বে বিচারপতির নেতৃত্বে সমগ্র পরিস্থিতি তদন্তের জন্য একটি গণতদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয় যে, 'আমরা মনে করি এই দাবিগুলো পূরণ করবার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। আমরা আশা করি জাতীয় সংসদ এ বিষয়ে যথাযথ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রমাণ করবে যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সংসদই এদেশের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল সংস্থার চেয়ে উচ্চতর ক্ষমতা ধারণ করে।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেকটি নৃশংস ঘটনা ঘটেছে গত সেপ্টেম্বরে। বাঘাইছড়িতে ২৮জন কাঠুরিয়াকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর অঞ্চলে বাঙালি পাহাড়ি উত্তেজনা বৃদ্ধির অপচেষ্টাও আমরা লক্ষ্য করি। এ ধরনের ঘটনায় লাভবান হতে পারে সেসব দেশী বিদেশী অপশক্তি যারা জনগণের ভোগান্তির বিনিময়ে নিজেরা লাভবান হয় ; যারা জনগণের নিরাপত্তার বিনিময়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা ও সম্পদে স্ফীত হয়। ঘটনার পরপরই কমিটি থেকে আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছি। আমরা এখানে পুনরুক্তি করে বলতে চাই যে, দরিদ্র, নিরস্ত্র ও নিরীহ কাঠুরিয়াদের হত্যাকারী যেই হোক তারা

পাহাড়ি-বাঙালি উভয়ের শত্রু, তাদের চেহারা উন্মোচন করা ও কঠোর শাস্তি বিধান এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের অন্যতম পূর্বশর্ত।

আমরা মনে করি সাম্প্রতিককালে কল্পনা চাকমা অপহরণ, রূপন চাকমা হত্যা ও তিনজন প্রতিবাদী নিখোঁজ এবং সবশেষে ২৮জন কাঠুরিয়ার হত্যাকাণ্ড আবারো প্রমাণ করেছে যে, কালক্ষেপণ করে বা সামরিক ব্যবস্থা প্রলম্বিত করে এই অঞ্চলের জনগণের ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান এবং এই সমাধানের জন্য বিভিন্ন সময়ে আমাদের কমিটি সমাজের অগ্রসর গণতান্ত্রিক শক্তির মতামতের সারমর্ম করে যে সুপারিশ বা দাবিনামা উপস্থিত করেছে তা অবশ্যই ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

এদেশের জনগণ দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে চেতনা অর্জন করেছেন তা এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এদেশের বাঙালির সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সবসময়ই সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের প্রধান অংশ ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিয়েছেন। এই ঐক্য গঠিত হয়েছে বেঁচে থাকার দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যেও। এই অবস্থায় জাতিগত সমস্যার সমাধান বাংলাদেশে অন্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক সহজ।

তবে আমরা এই সঙ্গে এটাও মনে করি যে, কয়েকটি বিষয়ে নিজেদের ধারণাকে স্পষ্ট রূপ না দিলে এবং পরিষ্কার অবস্থান গ্রহণ না করলে বাংলাদেশের এই জাতীয় সমস্যার কার্যকর সমাধান বা তার জন্য প্রয়োজনীয় জনমত আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এগুলো হ'ল :

১. বাংলাদেশ প্রধানত বাঙালি অধ্যুষিত দেশ হলেও এদেশ শুধুমাত্র বাঙালিদের বাসভূমি নয়। এখানে অন্যান্য জাতির উপস্থিতি আছে। এবং বহুজাতিক এই দেশের নাগরিক হিসেবে নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম-নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারও তাঁদের আছে। সাংবিধানিক ও আইনগত সকল ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতির প্রতিফলন থাকতে হবে। বৈচিত্র নিয়ে যেমন প্রকৃতি সমৃদ্ধ হয় তেমনি বহু ভাষা-সংস্কৃতি বর্ণ-ধর্মের বৈচিত্রর মধ্যে ঐক্য গড়েই মানুষ নির্মাণ করতে পারে সমৃদ্ধ জনপদ।

২. সামরিক বলপ্রয়োগ করে জাতীয় কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। জাতিগত বিদ্বেষ কখনও কারও জন্য শান্তি, নিরাপত্তা, গণতন্ত্রকে নিরাপদ করে না। এসব ব্যবস্থায় সবসময়ই লাভবান হয় দেশ বিদেশের বিভিন্ন অপশক্তি। চক্রান্ত ও সন্ত্রাসের পথ প্রশস্ত হয়, জনগণের সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সকল জাতির মুষ্টিমেয় বাদে সকল মানুষের ভোগান্তি বাড়ে, বাড়ে নিরাপত্তাহীনতা। সম্পদের অপচয়ে উৎপাদনশীল বিকাশের সম্ভাবনা পর্যুদস্ত হয়।

৩. একটি দেশে জাতিগত সমস্যাসহ সকল সমস্যার সমাধান ঐ দেশের জনগণকেই করতে হবে। দেশের মধ্যে এ ব্যাপারে উদ্যোগের ঘাটতি থাকলে বা সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশী-বিদেশী নানা প্রতারণা-প্রহসন-চক্রান্তের ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

আন্তর্জাতিক অনেক অপশক্তিও এই অবস্থাকে নিজেদের আর্থ-রাজনৈতিক-সামরিক স্বার্থ উদ্ধারের কাজে লাগাতে সক্ষম হয়।

৪. জাতিগত সমস্যা ও তার সমাধানের প্রশ্ন রাজনৈতিক। আর্থিক যোগান নির্ভর ত্রাণসংস্থা বা পেশাগত মানবাধিকার কিংবা আইনগত কার্যক্রম দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় এদেশের পাহাড়ি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম, নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে যত বেশি সম্পর্কিত ও ঘনিষ্ঠ হবে ততই এই সমস্যা একটি স্থায়ী সমাধানের দিকে অগ্রসর হবে।

প্রথম দুটো বিষয়ে বাংলাদেশের কোন সরকারই পরিষ্কার অবস্থান গ্রহণ করেনি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও কোন সরকার তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকার পরিচয় দেননি। আর সবগুলো বিষয়ে যে মাত্রায় সচেতনতা জনগণের মধ্যে বিশেষত রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে গড়ে ওঠা দরকার, তা এখনও গড়ে উঠেছে—এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করা কঠিন।

আমরা আশা করি, বর্তমান সেমিনারের মধ্য দিয়ে এসব বিষয় সকলের কাছে আরও পরিষ্কার হবে। আমরা আরও আশা করি যে, এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে আমরা আগে উত্থাপিত দাবি ও সুপারিশমালা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নির্ধারণ করতে সক্ষম হবো। যার মধ্য দিয়ে এদেশের পাহাড়ি বাঙালি নারী-পুরুষের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি সম্মিলিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হবেন যা ভারত-পাকিস্তানসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিরাজমান অধিকতর জটিল জাতিগত সমস্যা সমাধানেও দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে।

--

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

চাকমা উপন্যাস চাই

চাকমা ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ মোটে এক বছরের, তাও বাঙলা অনুবাদের হাত ধরে। ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে একটি প্রবন্ধ ফেঁদে বসা বেয়াদবির সামিল, এ ধরনের কম্ম ঘটান মস্ত মস্ত পণ্ডিত-সমালোচকেরা, তাঁদের কাছে বিদ্যাচর্চা মানে ছুরি কাঁচি নিয়ে শিল্পীদের ময়নাতদন্তে নামা। কিন্তু আমি আমার মাতৃভাষায় তোতলাতে তোতলাতে গল্প উপন্যাস লেখার চেষ্টা করি ; কানা হোক, খোঁড়া হোক, সেগুলো আমার অনেক কষ্ট, অনেক সুখ, অনেক পুলক ও অনেক উত্তেজনার প্রকাশ ; তাই ঐসব অজর, অক্ষম ও চোখে-পিচুটি-জমা মহাপণ্ডিতদের মতো কঠিন কঠিন দায়িত্ব নেওয়া কি আমার পোষায়?

তবে আমি কোন সাহসে চাকমা সাহিত্য নিয়ে লিখি? আমার সাহস হলো চাকমা বন্ধুদের সঙ্গে দিনের পর দিন চিঠি লেখা আর চিঠি পাওয়া ; বাঙলায় তাদের কবিতা, গল্প, রূপকথা পড়া এবং চাকমা ভাষায় সেগুলো শোনা ; তাদের সঙ্গে গল্প করা, ঝগড়া করা এবং আবার ভাব করার অভিজ্ঞতা। আরো আছে। কি?--- সবচেয়ে বেশি সাহস পেয়েছি তাদের সঙ্গে পাহাড়ে, জনপদে, নদীতে, পাঠশালায়, বিহারে, গানের জলসায় এবং কবিতার আসরে খুব কাছে থেকে তাদের দেখে। কয়েক মাস থেকে আমার কেবলি মনে হচ্ছে চাকমাদের উপন্যাস চাই। চাকমা শিল্পীর লেখা চাকমা ভাষার উপন্যাস চাই ; সেই উপন্যাসের বেশির ভাগ লোক চাকমা, তাদের বাড়ি রাঙামাটি কি খাগড়াছড়ি কি বান্দরবানের কোনো পাহাড়ি জনপদে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে তাদের বঞ্চনা, অপমান ও প্রতিরোধ এমন মিলেমিশে থাকবে যে একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যাবে না।

চাকমাদের পুরনো কাব্য উপাখ্যান 'রাধামন ধনপুদি'র বাঙলা অনুবাদ হয়েছে কি-না জানি না, আমি এক তরুণ চাকমা বন্ধুকে দিয়ে এর ছিটেফোঁটা সামান্য অংশ অনুবাদ করিয়ে নিয়ে পড়েছি, আর গল্পটা শুনেছি অনেকের মুখে। গেংগুলি বা কথকরা পুরুষানুক্রমে চাকমা জনপদে জনপদে এই উপাখ্যান সুর করে আবৃত্তি করে বেড়ান। এটি ছাড়াও সমিল ছন্দে রচিত আরো অনেক কাহিনী গেংগুলিরা এখনো আবৃত্তি করেন। অনুমান করতে পারি যে, তাঁদের সৃজনশীল আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চাকমা গাথায় নতুন নতুন প্রসঙ্গ যুক্ত হয়, পুরনো কিছু কিছু অংশ হয়তো ঝরেও পড়ে। তবে বড়ো ধরনের যোগ বিয়োগ বোধ হয় ঘটে না, কারণ পুরানো চাকমা গাথা তাদের গভীর ভালোবাসা ও ভক্তির সম্পদ, এর গায়ে বড়ো ধরনের চিড় ধরানো চাকমা গেংগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, যতোই জনপ্রিয় হোক, আধুনিক চাকমা কি এই উপাখ্যানগুলিতে সম্পূর্ণ সাড়া দিতে পারেন?

বাঙলায় চাকমা কবিতা পড়েছি অনেক, বাঙলা অনুবাদ পড়ে ও মূল চাকমায় শুনে এটুকু বুঝি যে চাকমা কবিরা আজ ক্ষুব্ধ। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার দুর্যোগ ও নিজদেশে পরবাসী হওয়ার অপমান তাদের কবিতাকে দিন দিন উত্তেজিত করে তুলছে।

আগে চাকমারা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে গেছে জীবিকার তাগিদে ; সেটা গৃহচ্যুতি তো নয়ই, এমন কি গৃহত্যাগও তাকে বলা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের, আরো আগে সমগ্র চট্টগ্রামের সমস্ত পাহাড় জুড়েই ছিলো তাদের বাড়ি, চাকমারা ছিলো মস্ত বড়ো, বিশাল বাড়ির বাসিন্দা। সব পাহাড়ই তাদের কোল দেওয়ার জন্যে উন্মুখ ; নিজেদের শরীর তারা উর্বর করে রাখতো, একেকটি পাহাড় নিজের সমস্ত রস উজাড় করে দিয়ে এইসব শান্ত ছেলে মেয়েদের মুখে অন্ন তুলে দিতো। পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা পাহাড়ের স্নেহ নিংড়ে নিয়ে ফের পাড়ি জমাতো অন্য পাহাড়ের দিকে। আবার এই অন্য পাহাড়িটিও তার দুগ্ধভারাক্রান্ত স্তন নিয়ে নীরবে তাকিয়েই থাকতো, ছেলেমেয়েরা এসে তার বুকের অন্ন তুলে নিলেই তার পরম তৃপ্তি। খেয়েদেয়ে তৃপ্ত ছেলেমেয়েরা পা বাড়ায় সামনের দিকে আর সুখী পাহাড় একটুখানি ঘুমিয়ে নিয়ে ফের নিজেকে উর্বর করে সাজাতে তৈরি হয়। পাহাড় এই ছেলেমেয়েদের কী না দিয়েছে? জুম চাষ করে তারা পাহাড়ের বুক থেকে তুলে এনেছে ধান, যব, নানান সবজি ; পাহাড়ের বন থেকে পেয়েছে পশু, পাখি, আর কতো রকমের ফল ; আবার ছেলেমেয়েদের পরনের কাপড়ের সংস্থানও হয়েছে পাহাড় থেকেই, পাহাড়ের কার্পাসে তাদের কাপড় তো হয়েছেই, এই তুলা দিয়ে রাজার খাজনাও মেটানো গেছে।

তাই এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যাওয়া পাহাড়িদের গৃহত্যাগ নয়, বরং মায়ের এক স্তন থেকে আরেক স্তনে মুখ গুঁজে মাকে নিবিড় করে অনুভব করা। এই মায়ের বুক থেকে শিশুর মুখ উপড়ে ফেলার চক্রান্ত কিন্তু আজকের নয়। দুশো বছর আগে গোটা উপমহাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করার দক্ষযজ্ঞের শিকার হয়েছে এই পাহাড়ি জাতিরাও। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে নিয়োজিত হয়েছিলো চাকমারা। ঐ সময়টি তো পূর্ব ভারতের সবটা জুড়েই বিস্ফোরণ ; সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ওয়াহাবি, ফরায়েজি। একই সময়ে কার্পাস মহলের জুমিয়ারা যে অন্যায় খাজনা দিতে অস্বীকার করে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তার মহিমা ঘোষণা করতে আমাদের এতো দ্বিধা কেন? দেশের ইতিহাসে তারা ঠাঁই পায় না কেন? দেশের এক কোণে থাকার কারণে তারা ইতিহাসেরও আড়ালে পড়ে যাবে? না-কি তাদের আড়াল করে রাখার চক্রান্তের অংশ হলো অন্য জাতের কাছে তাদের ইতিহাস গোপন করা আর তাদের নিজেদের ইতিহাস চাকমাদের ভুলিয়ে দেওয়া? ফরাসি বিপ্লবের পর বলা হয়েছে, বিপ্লব তার নেতাদের খেয়ে ফেলে। এখানে দেখি, বিপ্লবের নেতাদের বংশধররা লুকিয়ে রাখেন পূর্বপুরুষের শৌর্যের কাহিনী। সাম্রাজ্যবাদের তোষণে নিয়োজিত হয়ে জাতির ইতিহাস মুছে ফেলতে তাঁরা তৎপর হয়ে ওঠেন।

এতে ইতিহাসের ঘটনা হয়তো চাপা পড়ে, নায়কদের নাম ভুলে যায় মানুষ, ফন্দিবাজ পেশীশক্তির কাছে মাথা না নুইয়ে নিজেদের তুলার স্তূপে আগুন জ্বালাবার কথাও কেউ মনে রাখে না। কিন্তু সেই আগুন নেভে না। ধিকিধিকি করে তা জ্বলতে থাকে চাকমা রক্তের ভেতরে। তাদের ওপর একেকটি ঘা এলে তাই লাফিয়ে ওঠে দীপ্ত শিখায়।

উপমহাদেশের রাজনীতি থেকে পাহাড়িদের আড়ালে রাখার যতো চেষ্টাই করা হোক, এর ফল থেকে তারা রেহাই পাবে কেন? দেশ ভাগ হয়, দফায় দফায় দেশ স্বাধীন হয় আর চাকমাদের ঘরে লাগে নতুন নতুন ধাক্কা। গোটা দেশে আলো জ্বালাবার জন্যে তাদের বাড়িঘর ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্ধকার পানির নিচে। বাঁচার জন্যে তারা চলে যায় আরো ভেতরে, আরো আড়ালে। বাঁচার জন্যে লড়াই করতে করতে কষ্টে, দুর্যোগে ও অপমানে নিজেদের পরিচয় নিজেদের কাছে স্পষ্ট হয়। তারা উদ্যোগ নেয় সেই পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার আয়োজনে। তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রাষ্ট্রের কাছে গণ্য হয় স্পর্ধা বলে। এই স্বপ্ন মুছে ফেলার আদেশ তারা প্রত্যাখান করলে পেশীশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। আবার নতুন করে গৃহচ্যুত হবার পালা। তাদের রক্তে পাহাড়ের রঙ পাল্টায়, পেশীশক্তির কাছে তাদের মেয়েরা ভোগ্যবস্তুর বেশি মর্যাদা পায় না। আবার তাদের পালাবার পালা। তবে এবার শুধু পালানো নয়। আত্ম-পরিচয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবার তারা ফুটিয়ে তোলে স্পৃহায়, সেই স্পৃহা বিস্ফোরিত হয় সংকল্পে। চাকমারা, পাহাড়িরা রুখে দাঁড়ায়।

চাকমা কবিতা আজ এই স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার সংকল্পে উত্তেজিত। নরনারীর প্রেম সেখানে গৌণ। প্রকৃতি কেবল প্রকৃতি বলে কবিতায় ঠাঁই পায় না, প্রকৃতির হৃতসর্বস্ব চেহারা তাদের ক্রোধের কারণ। তাদের প্রকৃতি আজ পেশীসর্বস্ব শক্তির দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত। পাহাড়ি ছেলেমেয়েদের জন্যে সঞ্চিত পাহাড়ের বুকের অন্ন চলে যায় আজ অন্যের গ্রাসে, গাছপালা চেঁছে পাহাড়ের আব্রুহরণ চলছে অহরহ। পাহাড়ে চিবিদ গাছের জায়গায় আজ জলপাই রংয়ের ছাউনি, গোলাবারুদের গন্ধে পালিয়ে গেছে রংরাং পাখি। চাকমা কবিতা আজ গৃহচ্যুতি, মৃত্যু ও হত্যায় নীল এবং একই সঙ্গে প্রতিরোধের সংকল্পে রক্তাক্ত।

কবিতা হলো মানুষের অনুভূতির সারাৎসার। চাকমা কবিতা থেকে তাদের বেদনা ও ক্রোধ বেশ আঁচ করা যায়। কিন্তু তাদের নিত্যদিনের জীবনযাপন এবং এর পটভূমিতে ভাবনা ও প্রতিক্রিয়াকে না পেলে তাদের সামগ্রিক চেহারা দেখবো কি করে? চাকমা সমাজে আধুনিক ব্যক্তির উত্থান ঘটেছে বলেই তো জাতিগত অপমান তাদের গায়ে এভাবে লাগে, প্রত্যেককে স্পর্শ করে ব্যক্তিগতভাবে। তো এই আধুনিক ব্যক্তিকে সমাজের ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে এবং প্রতিবাদ, অসন্তোষ ও প্রতিরোধের ভেতর জানতে হলে উপন্যাস ছাড়া আর কোনো উপযুক্ত মাধ্যম আছে কি?

আধুনিক ব্যক্তির অনুভূতিতে সমাজবোধ প্রকাশের প্রধান মাধ্যম উপন্যাস। শুধু একক অনুভূতি নয়, কোনো একক মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নয়, কোনো সাধক পুরুষের জ্ঞানচর্চা নয়, কিংবা কেবল সামাজিক বিকাশের ইতিহাস নয়, রাজনৈতিক

আন্দোলনের কালপঞ্জী নয় কিংবা কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণাও নয়, বরং জীবনযাপনের মধ্যে মানুষের গোটা সত্তাটিকে বেদনায়, উদ্বেগে ও আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশের দায়িত্ব নেয় উপন্যাস। এভাবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ ঘটে এবং ব্যক্তি তাগিদ পায় মানুষ হবার জন্যে। মানুষের সমগ্র সত্তাটির প্রতি এরকম মনোযোগ দেওয়া এখন আর কোনো মাধ্যম কি শাস্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। দর্শনের আবেদন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে, কবিতা স্পর্শ করে আবেগকে। বিজ্ঞানের প্রধান বিবেচনাও মানুষ এবং মানুষই। সৃষ্টি, মহাশূন্য ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উন্মোচনে আজ বিজ্ঞান যেভাবে নিয়োজিত তারও চূড়ান্ত লক্ষ হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। কিন্তু মানুষের কল্যাণসাধন যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, তার বেদনা ও কষ্টের দিকে মনোযোগ না দিয়ে মানুষকেই ছাড়িয়ে যায় তখন তার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ আর থাকে না। আধুনিক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানেরই তৈরি। কিন্তু এই ব্যক্তির খোঁজখবর নেওয়া ও তার স্বপ্নকে লালন করার দায়িত্ব বিজ্ঞান নেয় না। ব্যক্তির নিঃসঙ্গতাকে সনাক্ত করে মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলার কাজটি নিয়েছে উপন্যাস। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে স্পেনের সারভান্তেস একটি রুগ্ন ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়েছিলেন ডন কুইকসোটকে। কুইকসোটের মৃত্যু তো তার যাত্রা রোধ করতে পারেনি ; যেখানেই ব্যক্তির বিকাশ ঘটেছে, উপন্যাস সেখানেই হাজির হয়েছে তার আয়না হয়ে। ব্যক্তির স্বপ্ন ও সংকটকে কেবল সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিফলিত করেই উপন্যাস কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। তার ব্যক্তিগত সংকটকে সনাক্ত করে সামাজিক সমস্যা বলে এবং এইভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। সংগঠিত শিক্ষিত সম্প্রদায় সচেতন হয় গোটা সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে।

চাকমা ব্যক্তির উদ্বোধন টের পাই তার তীব্র অপমানবোধের ভেতর, তার স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে এবং তার পরিচয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে। এই অপমানবোধ ও প্রতিরোধের স্পৃহা গৌরবান্বিত হয় চাকমা কবিতায়। কিন্তু কেবল মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান সম্পন্ন হতে পারে না। উপন্যাসে চাকমা সত্তা কেবল অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া আর সংকল্প দিয়ে চিহ্নিত হবে না, এর সবই আসবে জিজ্ঞাসা আর বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে। কেবল তখনই চাকমা আধুনিক ব্যক্তি তার জীবনযাপনে চাকমা ইতিহাস, সংগ্রাম ও ঐতিহ্যকে নতুনভাবে সন্ধান করার উদ্যোগ নেবে।

চাকমাদের সমৃদ্ধ কাব্য উপাখ্যান, অপূর্ব রূপকথা, লোকগীতি সবই নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হবে চাকমা উপন্যাসে। লোকসাহিত্য শুধু মিউজিয়ামে রাখার বস্তু নয়। চাকমা শিল্পীর কণ্ঠে চাকমা লোকগীতির সুরের আধুনিক প্রয়োগ শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আধুনিক সংকটে তার প্রয়োগ না করতে পারলে তার আবেদন তীব্র হবে কেন? গেংগুলিরা তাদের পূর্বপুরুষের গানের প্রতি ভক্তিতে গদগদ। তাঁদের গান যেমন চলছে, তেমনি চলবে। কিন্তু ঐ ভক্তির প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েও বলি যে, ভক্তি ঐতিহ্যকে আটকে রাখে একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যের গতিতে তা বরং বিঘ্নের সৃষ্টি করে। ভক্তির জায়গায় জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণ না এলে আধুনিক চাকমাকে তা কতোদিন আর উদ্বুদ্ধ করতে পারবে?

গেংগুলিদের ঐতিহ্যকে জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণের সাহায্যেই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে মেলাতে পারেন চাকমা ঔপন্যাসিক। আবার বলি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণের মধ্যেই সংগঠিত করতে পারে গোটা সমাজকে। স্বপ্নের বিশ্লেষণ ছাড়া স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার আয়োজন নেওয়া যায় না, জিজ্ঞাসাবঞ্চিত স্বপ্ন এক ইচ্ছাপূরণ মাত্র। উপন্যাসই সাধারণ মানুষের জীবনযাপনেও স্বপ্নকে সনাক্ত করে এবং তার বিশ্লেষণ করে তাকে সংকল্পে এবং সামাজিক সংকল্পে রূপান্তরিত করার আয়োজন ঘটায়।

উপন্যাস কোনো সমস্যার সমাধান দেয় না, কিন্তু মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার দিকে ইংগিত দেখায়। বঞ্চিত, অপমানিত ও নিগৃহীত চাকমার সংকটে ও সংগ্রামে উপন্যাস তাকে প্রতিফলন করার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনবোধকে পরোক্ষভাবে হলেও সংগঠিত করতে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করি।

চাকমা সমাজে ব্যক্তি উদ্বোধনের এই ক্লান্তিলগ্নে চাকমা ভাষা ও চাকমা জাতি আজ উপন্যাসের প্রতীক্ষা করছে। অনুপ্রাণিত ও দায়িত্বশীল চাকমা শিল্পী কি মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির এই তৃষ্ণা মেটাবার উদ্যোগ নেবেন না?

২৪. ৪. ১৯৯৩

সংস্কৃতি

জুলাই ১৯৯৩

চাকমা উপন্যাস চাই

[১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত *সংস্কৃতিতে* আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'চাকমা উপন্যাস চাই' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি সম্পর্কে কিছু সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রদান করে সংস্কৃতির সম্পাদক হিসেবে আমার কাছে চৌরত্ন মানিক্য ত্রিপুরা একটি চিঠি লিখেছিলেন ২১.৮.১৯৯৪ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

চৌরত্ন মানিক্য ত্রিপুরার চিঠিটির প্রাসঙ্গিক অংশ পুরোপুরি এখানে ছাপা হলো। সেই সঙ্গে ছাপা হলো তাঁর চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বক্তব্য– সম্পাদক]

চৌরত্ন মানিক্য ত্রিপুরার চিঠি

আপনার সম্পাদিত জুলাই '৯৩, ১৮ বর্ষ, নব পর্যায়ে ২য় বর্ষ : ৩য় সংখ্যার *সংস্কৃতি* গ্রন্থটি পুরনো বই পত্র গুছিয়ে রাখতে যেয়ে হাতে উঠে আসায় সেখানকার একটি পুরনো লেখা আমি বারবার পড়ি। লেখাটি ছিল বর্তমান যুগের খ্যাতিমান লেখক জনাব আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের। প্রসঙ্গ ছিল 'চাকমা উপন্যাস চাই'। তাঁর এ সুন্দর প্রস্তাবনার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও এটা সত্য যে, তাঁর এ প্রবন্ধের প্রতিটি ভাষায় তিনি যেন বোঝাতে চেয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার একচেটিয়াভাবে চাকমাদেরই। তিনি শুধু একটিবারও বুঝতে চাইলেন না তার এ লেখা পড়তে যেয়ে অন্যসব জাতিসত্তার লোকেরা কতটুকু আহত হবে। প্রবন্ধের এক কোণায় তিনি লিখেছেন—"উপমহাদেশের রাজনীতি থেকে পাহাড়িদের

আড়ালে রাখার যতো চেষ্টাই করা হোক, এর ফলে তারা রেহাই পাবে কেন? দেশ ভাগ হয়, দফায় দফায় দেশ স্বাধীন হয় আর চাকমাদের ঘরে লাগে নতুন নতুন ধাক্কা।' তাঁর 'পাহাড়ি এবং 'চাকমা' সম্বোধন দেখে মনে হয় যেন 'পাহাড়ি' মানে 'চাকমা' আর 'চাকমা' মানে 'পাহাড়ি। অথচ 'পাহাড়ি' এবং 'চাকমা' শব্দদ্বয়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে তিনিওতো অজ্ঞ নন। পাহাড়ি মানে ১০ ভাষাভাষী ১৩টি জাতিসত্তা আর চাকমা মানে সেই জাতি সত্তাসমূহের একটি অংশ—এ সংজ্ঞাটি নিশ্চয় তিনি জানেন। তাঁর কথামতে ধরতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু চাকমারাই নির্যাতিত আর অন্য জাতিসত্তাগুলো যেন চরম সুখে-মহানন্দে দিনাতিপাত করছে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। কারণ, তিনি হয়ত জানেন না ৮১ সালে প্রথমে কোথায় হামলা হয়েছিল, কারা নিঃগৃহীত হয়েছিল। ৮১ সালে মাটিরাংগার ৪/৫ শত ত্রিপুরা পরিবার আর ২/৩ শত মারমা পরিবারকে যেভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং অবশিষ্টদের ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, সে কথা ভাবলে আজও আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

এই হত্যাকাণ্ডের একটি নিষ্ঠুর হত্যাকাহিনী বলতে আজ খুব ইচ্ছে করছে। গল্পটি আমি আমাদের অনেক ছাত্র নেতা, বন্ধুদের অনেককেই বলেছি। "আমাদের এলাকার যামিনী হেডম্যান পাড়ার একজন বৃদ্ধ ছিল। তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিলনা। তাকে একজন অনুপ্রবেশকারী সরলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের বাবা ডাকেন। বৃদ্ধের প্রচুর জমি-জমা ছিল, যে জমি সে পাহাড় কেটে গড়েছিল। বৃদ্ধটি সরল মনে ঐ অনুপ্রবেশকারীকে পুত্র স্নেহে কিছু অংশ জমি চাষের জন্য দেয়। '৮১ সালে যখন সংগ্রাম শুরু হল, তখন ঐ অনুপ্রবেশকারী চুপি চুপি তার ধর্মের বাবার ঘরে যান। সে সময় বৃদ্ধ তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীসহ ওপারে (ভারতে) যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, কিন্তু পথে অনুপ্রবেশকারীদের কবলে পড়ার ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারছিলেন না। সে দুর্যোগের সময় পুত্রকে কাছে পেয়ে বাঁচার উপায় খোঁজে। ধর্মের ছেলে তাদের দুজনকে ভারতে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেয়ার মানসে নিয়ে যান। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, বেচারা বৃদ্ধটি স্ত্রীসহ নিজের জমির পাশের কুয়ায় শুয়ে আছেন। মাথা আর দেহ পৃথক পৃথক করে পড়ে আছে জমিতে। জমির সতেজ সবুজ ঘাস তাদের রক্তে লাল হয়ে আছে।" তাহলে দেখুন, চাকমা ছাড়া অন্যরাও কেমন নির্যাতিত, নিপীড়িত, গৃহচ্যুত। শুধু এখানেই শেষ নয়। জানা অজানা কত নির্যাতন যে হয়ে যাচ্ছে তার সবটি তো আর সবার কাছে জানা নেই। স্বদেশেও মানুষ কখনো কখনো উদ্বাস্তু হয়। যাকে আমরা 'স্থানীয় উদ্বাস্তু' বলি। মাটিরাংগার আরেক মারমা পরিবারের কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা যোগ্য। তিনি ছিলেন চৌধুরী। ছিলেন বললাম এ কারণে যে, আগে চৌধুরী নামের সাথে তার আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্যতা থাকলেও এখন আর তেমনটি নেই। কারণ, তাঁর প্রচুর পরিমাণে বাঁশ বাগান ছিল। যে বাগান তাঁর জীবনের মোড়কে ক্ষণিকেই বদলিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ যার উপর ভিত্তি করে তাঁর সংসার চলত। তাঁর নানা কি দাদা ছিলেন তৎকালীন 'মং রাজার' আমলের বাজার চৌধুরী, যে কিনা রাজার পক্ষে কর আদায় করতেন। আলোচ্য বিষয়ের চৌধুরী এখন সেই হাই-ফাই পরিবারের নন। তিনি এখন সামান্য খেটে খাওয়া মানুষ। তিনি ঐ বাঁশ বাগানে সুন্দর করে ঘর বেঁধে থাকতে চেয়েছিলেন। সেই স্বপ্নের

বাগান আজ অস্ত্রের বাগানে পরিণত। কারণ, এখানে আজ নিয়মিত সেনা প্রশিক্ষণ চলে। এ বাগানটি বহু বছর ধরে সেনাদের ক্যাম্পে পরিণত হয়ে জবর দখলে আছে। তাঁর এ জবরদখলে কবলিত স্বপ্নের বাগানে আজ বাঁশের বদলে নিত্য নতুন অত্যাধুনিক অস্ত্রের চাষ হচ্ছে। বছর ফুরোলে নামে মাত্র কিছু টাকা পাওয়া (যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল) ছাড়া তিনি এখন সে বাগান সম্পর্কে আর কিছুই জানেন না।

ইলিয়াস সাহেব চাকমা ভাষায় রচিত উপন্যাস পড়তে চান—তাতো ভাল কথা। তাই বলে অন্য সব কটা অজ্ঞজনদের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে একা 'চাকমাদের সমস্যা' বলা তাঁর মত বুদ্ধিজীবী লেখকের উচিৎ হয়নি বলে আমার ধারণা।

তিনি আরো লিখেছেন "..... তার মহিমা ঘোষণা করতে আমাদের এত দ্বিধা কেন? দেশের ইতিহাসে তারা ঠাই পায় না কেন? দেশের এক কোণে থাকার কারণে তারা ইতিহাসেরও আড়ালে পড়ে যাবে? নাকি তাদের আড়াল করে রাখার চক্রান্তের অংশ হলো অন্য জাতের কাছে তাদের ইতিহাস গোপন করা আর তাদের নিজেদের ইতিহাস চাকমাদের ভুলিয়ে দেওয়া?" আসলে এই উক্তিগুলো অবশ্য চিন্তার বিষয়। কারণ, বাংলাদেশে শুধুমাত্র চাকমাদের কেন, যে কোন ইতিহাসকে এবং সেই ইতিহাসের মহিমাকে ঘোষণা করার দ্বিধাবোধ জিনিষটা যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, মারমা রাজবংশ (অবশ্য আগে 'মগ' নামেই পরিচিত ছিল) এককালে দুর্দম প্রতাপশালী এক রাজবংশ ছিল বাংলাদেশ সহ পাক–ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহদাংশ জুড়ে। তাদের ইতিহাস আজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত কারো জানা নেই। কারণ, সত্য প্রকাশে আমরা দ্বিধাহীন নই। অথচ আজও প্রবাদ হিসেবে "মগের মুল্লুক" কথাটি প্রচলিত। এ কথাটির ঐতিহাসিক অর্থও আমাদের অনেকেরই জানা নেই। এ দিকে ঢাকার মগবাজারও নিশ্চয় কোনো মারমা রাজবংশ কর্তৃক স্থাপিত।

ত্রিপুরা রাজবংশের কথাই বা বাদ দিই কি করে। এককালে ত্রিপুরা রাজারা এ উপমহাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। অথচ, তাদের সঠিক ইতিহাস কি আমাদের জানা আছে? জানা নেই। কারণ, সত্যকথা প্রকাশ করার মুখ আমাদের নেই। আমাদের মুখ আর মন শুধু দ্বিধাবোধ করার জন্যে। সেই স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে নোয়াখালী, কুমিল্লা সহ বাংলাদেশের বৃহদংশ ছিল।

বার ভূঁইয়াতে আমারা নোয়াখালীর একজন ত্রিপুরা জমিদারের নাম পাই। যিনি বার ভূঁইয়া জমিদাররা পরাজিত হয়ে বৃটিশ সরকারের নিকট আত্মসমর্পন করলেও ধরা না দিয়ে বীরত্বের পরিচয় বহন করে পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মায় আত্মগোপন করেন। অথচ, তাঁর সঠিক নাম জানার অধিকার পর্যন্ত আমাদের (বর্তমান প্রজন্মের) নেই। কেউ বলেন, তাঁর নাম 'অনন্ত মাণিক্য' কেউ বলেন 'লক্ষণ মাণিক্য'। এমনকি শুধুমাত্র এক ব্যক্তিই (যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) এক কাহিনীতে তাঁর নাম দু জায়গায় দুইভাবে লিখেছেন।

তাহলে দেখুন সঠিক ইতিহাস আর আবিষ্কৃত হবে কি করে? বোধকরি, আমি প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছি। তো উমর দা আপনার মাধ্যমে আমি জনাব ইলিয়াসকে

অনুরোধ ও মিনতি জানাতে চাই, তিনি যেন শুধু পৃথকভাবে চাকমার কথা না বলে আমাদের সবার কথা বলেন।

"দেশের ইতিহাসে তারা ঠাঁই পায়না কেন?" "দেশের এক কোণে থেকে কি তারা ইতিহাসেরও আড়ালে পড়ে যাবে?" "নাকি তাদের আড়াল করে রাখার চক্রান্তের অংশ হল অন্য জাতের কাছে তাদের ইতিহাস গোপন করা আর তাদের নিজেদের ইতিহাসে চাকমাদের ভুলিয়ে দেওয়া?' এ উক্তিগুলো তিনি শুধু চাকমাদের স্বার্থেই ব্যবহার করেছেন। এগুলো কি সব জাতিসত্তার জন্য, তাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে না? নাকি আমরা নিকৃষ্ট-ছোটজাত—অনুন্নত বলে আমাদের পক্ষে কথা বলার মত কেউ নেই? তাহলে কি আমরা অনুন্নত বলে চিরদিন অনুন্নত থেকে যাব? আমাদের দিকে কি কেউই সহানুভূতির চোখ তুলে তাকাবেন না?

২১.৮.৯৪

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বক্তব্য

জুলাই ১৯৯৩ সংখ্যা '*সংস্কৃতি*'তে আমার 'চাকমা উপন্যাস চাই' শীর্ষক আলোচনাটি পড়ে চৌরত্ন মাণিক্য ত্রিপুরা '*সংস্কৃতি*'র সম্পাদককে চিঠি লিখে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আমার লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্যে তাঁকে অনেক ধন্যবাদ।

আমার লেখাটিতে বাঙলাদেশের পাহাড়ি জাতিসমূহের ওপর নির্যাতন, তাদের যন্ত্রণা ও বেদনার প্রকাশ চৌরত্ন মাণিক্যের কাছে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। আমার আলোচনাটিতে একটি বিশেষ জাতির ওপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকায় অন্যান্য জাতি উপেক্ষিত হয়েছে বলে ধারণা করে তিনি ক্ষুব্ধ। তাঁর ক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু এই ক্ষোভ কতোটা সঙ্গত তা বিবেচনা করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানাই।

আমাদের পাহাড়ি জাতিসমূহের ওপর রাষ্ট্রীয় জুলুম ও শোষণ এবং বাঙালি মধ্যবিত্তের অনেকের এ জুলুম ও শোষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এইসব কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দান এবং অধিকাংশের চরম উদাসীনতার ফলে আজ পাহাড়িদের সহ্যের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা রুখে দাঁড়িয়েছে জুলুমের অবসান ঘটাবার সংকল্প নিয়ে। পুঁজির প্রসার, শিল্প বিপ্লব কিংবা তথাকথিত আধুনিক বিদ্যাচর্চার ব্যাপক বিস্তার ছাড়াই তাদের প্রতিরোধের স্পৃহাই তাদের মধ্যে তীব্র আত্মসচেতনতার সৃষ্টি করেছে। তাই থেকে তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ব্যক্তির স্ফুরণ। সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির বিকাশ হলো কোনো সমাজে উপন্যাস রচনার একটি প্রধান শর্ত। এদিক থেকে বলা যায়, পাহাড়ি ভাষাগুলির অন্তত কোনো কোনোটিতে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এখন প্রস্তুত। আবার উপন্যাস সমাজকে প্রতিফলিত করেই ফুরিয়ে যায় না, সমাজের সংগঠনেও তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের ভাষাসমূহের উপন্যাস রচিত হওয়াকে আমি জরুরি বিবেচনা করি।

এটা আমাদের একাধিক পাহাড়ি ভাষা ও জাতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তবে আমি বিশেষভাবে কিংবা কেবল চাকমা জাতি ও চাকমা ভাষা সম্বন্ধে লিখলাম কেন?

এর প্রথম কারণ এই যে, বাঙলা অনুবাদের মাধ্যমে চাকমা ভাষার পুরনো ও সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে আমি একটু ওয়াকিবহাল। ঘটনাচক্রে চাকমা ভাষাভাষী কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং কয়েক বছরে এই পরিচয় পরিণত হয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে। তাঁদের মধ্যে চাকমা ভাষার কবি আছেন, গায়ক, শিক্ষক আছেন, ছাত্রও আছেন। তাঁদের সঙ্গে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির কিছু কিছু চাকমা গ্রামে যাবার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁদেরই সূত্রে পুরনো চাকমা গাথা শুনেছি, আবার কবিতা পাঠের আসরেও হাজির হয়েছি। ফলে গভীরভাবে না হলেও তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে খানিকটা পরিচয় আমার হয়েছে এবং তাঁদের বেদনা, বঞ্চনা, ক্ষোভ ও একই সঙ্গে প্রতিরোধের স্পৃহা আমি অনুভব করতে পারি।

পাহাড়ি কোন জাতি কতোটা নির্যাতনের শিকার হলো এ নিয়ে চুলচেরা হিসাব না করেও কাণ্ডজ্ঞান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাদের সবাই দীর্ঘকাল ধরে নানা জাতির শাসকদের দ্বারা শোষিত হয়ে আসে। এখন শাসনের ভার বাঙালির হাতে, সুতরাং পাহাড়িদের শোষণ করার কাজটিও সম্পন্ন করছে বাঙালিরাই। চাকমাদের সম্বন্ধে এসব কথা আমার লেখায় উল্লেখিত হলেও অন্যান্য পাহাড়ি জাতির প্রসঙ্গে আসেনি।

আমার লেখাটি চাকমা উপন্যাস নিয়ে, চাকমা ভাষায় উপন্যাস লেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। উপন্যাস লেখা হয় কিংবা লেখা হবে কোনো বিশেষ ভাষায়। ভারতীয় বা উপমহাদেশীয় উপন্যাস বলে কিছু নেই। যা আছে তা হলো বাঙলা উপন্যাস, উর্দু উপন্যাস, হিন্দি উপন্যাস, মারাঠা উপন্যাস, তেলেগু উপন্যাস প্রভৃতি।

ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ একবার তাঁর দেশে যাবতীয় সাহিত্যকর্মকে আলাদা আলাদা ভাষার নামে পরিচিতি না করে কেবল ভারতীয় সাহিত্য বলে চিহ্নিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাব কেউ বিবেচনার যোগ্য বলে গণ্য করেননি। কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই করবে না। তবে হ্যাঁ, ভারতীয় সব ভাষার উপন্যাসের কোনো কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেখানে ইংরেজি বা ফরাসি বা জার্মান বা স্প্যানিশ উপন্যাস থেকে তাদের আলাদা বলে সনাক্ত করা যায়। ইউরোপের ভাষাগুলোর উপন্যাসেরও তেমনি চিহ্ন থাকতে পারে এশিয়ার উপন্যাস থেকে যার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম পরিচয় তার ভাষা, সেটা লুপ্ত করার কোনো উপায়ই থাকতে পারে না।

পাহাড়ি ভাষাগুলোর সাহিত্য মাধ্যমগুলোর প্রথম পরিচয় তাদের ভাষা। পাহাড়ি ভাষাগুলোর কবিতায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভাষাগুলির প্রত্যেকটির নিশ্চয়ই নিজের নিজের এমন সব লক্ষণ আছে যার একটি থেকে অন্যটি পৃথক। চৌরত্ন মাণিক্যের প্রতিক্রিয়া থেকেও তা স্পষ্ট, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে পাহাড়িদের নির্যাতিত হওয়ার ব্যাপারেও তিনি প্রত্যেক জাতির মানুষের বিভিন্ন ঘটনা আলাদাভাবে তুলে ধরতে আগ্রহী। তাদের ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি

কখনোই মুছে ফেলতে চাইবেন না। চাকমা ভাষার উপন্যাসের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে ঐ ভাষা নিয়ে কথা বলার মধ্যেই। এখানে পাহাড়ি অন্য ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করার সুযোগ নেই।

কোনো ভাষার উপন্যাস নিয়ে বা উপন্যাসের সম্ভাবনা নিয়ে বলতে গেলে সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মানুষ, তাদের সমাজ, তাদের বেদনা ও আনন্দ, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প, তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের প্রসঙ্গ অবশ্যই আসবে। এভাবে আমার ছোটো আলোচনাটিতে চাকমা জাতির প্রসঙ্গ এসেছে। এতে কিন্তু অন্যান্য পাহাড়ি জাতিকে উপেক্ষা করা বা তাদের প্রতি উদাসীন থাকা বোঝায় না এবং তাদের ওপর নির্যাতন ও শোষণ এবং এর বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়ানোর সঙ্কল্পও ঘুণাক্ষরেও অস্বীকার করা হয় না। চাকমাদের মতো মার্মা, ত্রিপুরা প্রভৃতি জাতিও নির্যাতনের শিকার হলেও চাকমা ভাষায় উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধে তাদের কথা বলা কি প্রাসঙ্গিক হতো?

খুব সম্প্রতি পাহাড়িদের ওপর জুলুম নিয়ে কিছু কিছু বাঙালি শিক্ষিত মানুষ উদ্বিগ্ন। কিন্তু এই জাতিগুলির সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে তাঁদের আগ্রহ কতোটুক? তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহী না হয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়ে পাহাড়িদের তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করতে চান। এটা পাহাড়িদের জন্যে গৌরবের ব্যাপার নয়। কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে এবং সেই অজ্ঞতা মোচনের তাগিদ ছাড়াই তাদের সংগ্রামে শরিক হওয়ার প্রতিজ্ঞা সন্দেহজনক। আবার তেমনি কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারে ঝাপসা ধারণা নিয়ে তাদের সম্বন্ধে লেখাও তেমনি বেয়াদবির সামিল।

৫.১১.১৯৯৫

সাক্ষাৎকার

"পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের উদাসীনতা শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জার বিষয়ও বটে"

প্রশ্ন : বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি কতখানি অবগত?

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : সরকারি প্রচার মাধ্যম যতোই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক আর বেসরকারি কাগজপত্র যতোই এড়িয়ে চলুক, দেশবাসী আজ জানে যে গত কয়েক বছর ধরেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরতিহীনভাবে রক্তপাত ঘটে চলেছে। সেখানকার অধিবাসীদের নিজ নিজ জাতিসত্তা নিয়ে টিকে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে, নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে গণ্য করা হয় ঔদ্ধত্য বলে এবং তাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবি বিবেচিত হয় অপরাধ হিসাবে। তাদের ঐ অধিকার, ইচ্ছা ও দাবিকে সমূলে উৎপাটনের জন্যে শাসকদের নির্যাতন শুরু হয় পাকিস্তানী আমলে।

বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তাই রূপ নিয়েছে হিংস্র আক্রমণে। প্রথমে নিজভূমে তাদের পরবাসী করে রাখার জন্য এবং পরে ভিটেমাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার খবরও পাই বৈকি। ১৯৮১ সালে আমি রাঙামাটি ও বান্দরবানের কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিলাম। বান্দরবানে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুরং ছাত্রকে। তখন নিজের চোখে দেখে এবং পাহাড়ি ও বাঙালি অধিবাসীদের মুখে কখনো একই রকম কখনো পরস্পরবিরোধী কথা শুনে ওখানকার অবস্থা অনেকটাই আঁচ করতে পারি। এরপর প্রায় কয়েক মাস কেটে গেলো। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়েছি। আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংস্থার প্রতিবেদন পড়েছি। রাডার পড়ার সুযোগও পাই। এ ছাড়া সরকারের পরিবেশিত তথ্য থেকেও কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করি, তবু খুব লজ্জা ও গ্লানির সঙ্গে বলি, আমাদের এই ছোট দেশটির ঐ এলাকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও জরুরি অনেক কিছুই আমার জানা নাই। ভালো করে যেটুকু জানি তার ওপর ভিত্তি করেই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন : এ দেশের সংবাদ মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলির সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না। তার জন্য আপনি কাকে দায়ী করেন?

আ. ই : সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলি সম্বন্ধে বলার মানে হয় না। সেখানে মন্ত্রী, নিমমন্ত্রী, আমলা এবং নিম আমলার মামাতো ভাইয়ের বাড়িওয়ালার শালার বিড়ালের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা যাবে, কিন্তু গোলাম আযমের ফাঁসি দাবি করে অনুষ্ঠিত গণআদালতের বিশাল সমাবেশের খবরটা বেমালুম চেপে যেতে হবে। তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হত্যাযজ্ঞের খবর দেবে কি করে? কিন্তু দেশে বেসরকারি ও বিরোধী দলের খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সাময়িকী এবং মাসিক পত্রিকার তো অভাব নেই। সেসব জায়গায় পার্বত্য এলাকার সংঘর্ষ, হত্যা ও নারী নির্যাতনের ব্যাপারে টু শব্দটি করা হয় না কেন? শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এক ধরনের উগ্র ও উদ্ভট জাতীয়তাবাদী উন্নাসিকতা আছে যার ফলে একটু ভিন্ন সংস্কৃতির নিকটতম প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখ থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখেন। নিজের দেশের সংখ্যালঘু বিভিন্ন জাতিসত্তার সদস্যদের সম্বন্ধে এঁদের সীমাহীন অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য। বাঙালি শিক্ষিত সমাজের যে অংশটি বিদ্যাচর্চা করেন, সাহিত্য সৃষ্টি করেন কিংবা শিল্পের নানা মাধ্যমে নিয়োজিত রয়েছেন দেশেরই কোনো কোনো অংশের মানুষ সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা এবং উন্নাসিকতাই পাহাড়ি মানুষের সমস্যা সম্বন্ধে দেশবাসীর অজ্ঞ ও উদাসীন থাকার প্রধান কারণ।

প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের একটা অঞ্চল, অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অঞ্চলের জনশক্তি ও সম্পদকে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে লাগাবার পরিবর্তে বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করা হচ্ছে ঐ এলাকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে দাবিয়ে রাখতে। বনজ সম্পদসহ কোটি কোটি টাকার সম্পদ তছনছ হচ্ছে। এর শেষ কোথায় ?

আ. ই : আমিও জানতে চাই এর শেষ কোথায়? শুধু সরকারকে দোষ দেবো কেন? দেশের রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবী, সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র—কেউই কি বুঝতে পান যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান অবস্থা জারি থাকলে দেশের অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত কোথায় মুখ থুবড়ে পড়বে? এই দরিদ্র দেশের মানুষের দারিদ্র নামবে কোন পর্যায়ে? মধ্যবিত্তের লেখাপড়া, বিদ্যাচর্চা যাবে কোন রসাতলে? পার্বত্য চট্টগ্রামের আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে তার আঁচ থেকে বাঁচবে কে?

প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পেশকৃত ৫ দফা সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।

আ. ই : পাঁচ দফায় পাহাড়ি ছাত্রদের গণতান্ত্রিক মনোভাব ও বিবেচনাবোধের পরিচয় পাই। তবে জাতীয় সংসদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটি কি করতে পারে? তাদের কাজ করতে হবে গঠনতন্ত্র অনুসারে। গঠনতন্ত্রে দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার কোনো ব্যবস্থা আছে কি? আর জাতীয় সংসদে পাহাড়ি প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে পাহাড়ি রাজাকার বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোন কাজ হবে? ৩ নম্বর দফা সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজই ব্যবস্থা নিতে পারে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা কে কোন বিষয় পড়বে, কার যোগ্যতা কতটুকু তার বিচার করার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকা উচিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করবে। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, তা সশস্ত্র বা নিরস্ত্র, হিংস্র বা নিরীহ যাই হোক না কেন, এই ব্যাপারে তাদের কোনো রকম নাক গলানো বরদাশত করা উচিত নয়।

প্রশ্ন : দেশের লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী প্রমুখের পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে দায়দায়িত্ব কতখানি বলে মনে করেন?

আ. ই : বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই দেশের ছোট জাতিসত্তাগুলির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে নস্যাৎ করার জন্যে যখন নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলে তখন ঐ লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের উদাসীনতা শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জার বিষয়ও বটে। ভারতে হিন্দু মৌলবাদীরা বাবরি মসজিদে ইতর আক্রমণ চালালে আমরা সঙ্গতভাবেই তার প্রতিবাদ করি। বাঙলাদেশে মুসলমান মৌলবাদীদের পাশবিক আস্ফালনে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংকটাপন্ন হলে আমরা রুখে দাঁড়াই। এ সবই বাঙালি লেখকদের দায়িত্ববোধ ও সাহসের পরিচয় দেয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে গত কয়েক বছর ধরে যে অবিরাম নির্যাতন চলছে তা নিয়ে এরা নীরব কেন? গত বছর অক্টোবরে খাগড়াছড়ির দুটো গ্রামের একটিতে দুর্গাপূজার জন্যে তৈরি মূর্তি ভেঙে ফেলা হলো, আরেকটি বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি ভাঙা হলো, একই জেলায় একই মাসে একটি গ্রামে অপারেশন চালাতে গিয়ে একটি বাড়িতে পুরুষদের বেঁধে রেখে মা ও মেয়েকে এক সঙ্গে বলাৎকার

করা হলো। লেখকদের মধ্যে এসব ক্ষোভের সঞ্চার করে না কেন? কয়েক বছর আগে জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস ঢাকায় এলে আমাদের লেখকদের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা নিয়ে গভীর আক্ষেপ করে যান। আমরা কিন্তু তাঁর আক্ষেপে সাড়া দিইনি। লেখকদের এই প্রতিক্রিয়া কিংবা প্রতিক্রিয়ার অভাব মোটেই শিল্পীসুলভ নয়।

একই দেশের এবং স্বতন্ত্র হলেও কাছাকাছি সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় রাখা লেখকদের অপরিহার্য কর্তব্য। যেখানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সংস্কৃতি বিপন্ন হলে যে কোনো শিল্পী তাতে উদ্বেগ বোধ না করে পারেন না, সেখানে আমাদেরই কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখী হলে সমগ্র জাতির স্বার্থেই তাদের এর প্রতিকারে উচ্চকণ্ঠ হওয়া উচিত। শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের কথা যদি নাও বলি, কেবল তার শিল্পচর্চার জন্যেও নিজের দেশের অধিবাসীদের ওপর নির্যাতন নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার। দেশের ভেতরেই ভয়াবহ, রক্তাক্ত ও বিভীষিকাময় এবং একই সাথে সাহসী ও সংকল্পবদ্ধ ঘটনা ঘটে চলেছে, এ নিয়ে লেখক ও শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতকর্মীরা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সচেতন ও প্রতিবাদী করে তোলার কাজে অবশ্যই এগিয়ে আসতে পারেন।

প্রশ্ন : কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান হতে পারে? আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

আ. ই : সমাধান বাংলানো আমার সাধ্য ও এখতিয়ারের বাইরে। একজন লেখক হিসাবে আমি কেবল সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার অনুভূতির কথা বলতে পারি।

প্রথমত ও প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্যাকে প্রত্যেক বাঙালিকে নিজের সমস্যা বলে অনুভব করতে হবে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ ও ঘরে ঘরে অগ্নি সংযোগের ঘটনা আজো আমাদের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, রাজাকার আলবদরদের আমরা এখনো ফাঁসি দাবি করি। আমাদের দেশের যে কোন জাতিসত্তার ওপর নির্যাতন আমাদের মধ্যে একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা উচিত, তা হলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এর প্রতিকারে প্রতিরোধের লক্ষ্যে এগিয়ে আসবেন।

পাহাড়িদের জমিতে জোর করে যাঁদের বসানো হচ্ছে তাঁরা হলেন নিরীহ ও গরিব বাঙালি কৃষক। এঁদের প্রতি কোনো ভালোবাসা থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পাহাড়িদের উচ্ছেদ করার জন্যে এঁদের ব্যবহার করা হচ্ছে। পাহাড়িদের যদি নিশ্চিহ্ন করা যায় তো তার পর পরই এঁদেরও ঐসব জমি থেকে নির্মূল করা হবে, ঐ জমি দখলের জন্যে তখন হামলে পড়বে দেশের ধনী, বুর্জোয়া সুবিধাভোগীর দল। এই ধরনের ব্যাপার এই উপমহাদেশে আগেও ঘটেছে। বাঙালি নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সঙ্গে বাঙালি বুর্জোয়া, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। নির্যাতিত ও শোষিত পাহাড়ি এবং নির্যাতিত ও শোষিত ও প্রতারিত বাঙালি শ্রমজীবী অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এই সত্যটি সবার মধ্যে উপলব্ধি করাবার দায়িত্ব বাঙালি ও পাহাড়ি লেখক, শিল্পী ও রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর।

এখন বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অত্যন্ত কম। এটা খুব দুঃখজনক। উভয় সংস্কৃতির জন্যেই এটা ক্ষতিকর। পরস্পরের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরস্পরকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। পরস্পরকে না চিনলে কেউ কারো সমস্যা বুঝতে পারবেন না, শুধু তথ্য জেনে কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিসত্তার সমস্যা সম্বন্ধে কেউ উদ্বিগ্ন হতে পারে না। এই ব্যাপারে পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের শিক্ষিত ও সচেতন অংশের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাঁদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে বাঙালিদের অবগত করার দায়িত্ব তাঁরাই নেবেন। হিল লিটারেচার ফোরামের মুখপত্র *'রাডার'* এই ব্যাপারে উদাসীন। পাহাড়িদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারটি সফলভাবে প্রকাশ করলেও তাদের সাহিত্যকর্ম বা সংস্কৃতির কোনো পরিচয় দেওয়ার উদ্যোগ সেখানে নেই। বিভিন্ন জাতিসত্তার রূপকথা, গাথা, গল্প, কবিতা, নাটক, গান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেই বাঙালি তাঁদের আত্মীয় বলে পাহাড়িদের চিনতে পারবে। রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে সঙ্গেই এই কাজগুলো করতে হবে।

পাহাড়িরা ২১শে ফেব্রুয়ারিকে তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার দিবস হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। বাঙালিরা কিন্তু এই দিনটিকে শুধু বাঙলা ভাষা আদায়ের আন্দোলনের দিবস হিসাবে বিবেচনা করেন না, তা হলে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাঙলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গেই এর কার্যকারিতা ফুরিয়ে যেতো। বাঙালির প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলন প্রত্যেক বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নতুন গতি ও উত্তাপ লাভ করেছে। পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহ যদি ঐ দিনেই তাঁদের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি দিবস হিসাবে চিহ্নিত করেন তাহলে বাঙালিরা একদিকে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করবেন এবং অন্যদিকে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা মনে করে তাঁরা অন্য ভাষাভাষীদের ভাষার দাবিকে সম্মান করতে শিখবেন। পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের প্রত্যেকের ইতিহাস সম্বন্ধে দেশের সবাইকে ওয়াকিবহাল করতে হবে। এঁদের বিদ্রোহের ঐতিহ্যও দীর্ঘদিনের। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বেচ্ছাচারিতা ও শোষণের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির বিদ্রোহের বিবরণ অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। তাঁদের এই বীরত্বব্যঞ্জক ও সাহসী প্রতিরোধের ঐতিহ্যে চাকমাদের সঙ্গে বাঙালিও গৌরব বোধ করতে পারেন যদি এই ইতিহাস যথাযথভাবে প্রচার করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক কার্যকলাপের তুলনায় শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নতুন মূল্যায়ন কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

রাডার, বৈসাবি সংখ্যা

১৩ এপ্রিল ১৯৯২

সাক্ষাৎকার

"পাহাড়ি জনগণের সাথে দেশের ব্যাপক অ-পাহাড়ি জনগণের কোন বিরোধ নেই"

ফয়জুল হাকিম
সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন

প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু পাহাড়ি জনগণের যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চলছে তাকে আপনার সংগঠন কিভাবে মূল্যায়ন করে? এ সমস্যার ব্যাপারে আপনাদের সংগঠনের কি কর্মসূচি আছে?

ফয়জুল হাকিম : পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু পাহাড়ি জনগণের যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চলছে তাকে আমাদের সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে। এ সমস্যার ব্যাপারে আমাদের সংগঠনের কর্মসূচি মূলত আমাদের রাজনৈতিক জোট, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতৃত্বে জাতিগত সংখ্যালঘু ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করেছে।

প্রশ্ন : পার্বত্য এলাকায় যে ব্যাপক সামরিকীকরণ এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গোপন সার্কুলারের মাধ্যমে যে বিপুল অ-পাহাড়ি পুনর্বাসন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য?

ফ. হা. : পার্বত্য এলাকায় যে ব্যাপক সামরিকীকরণ এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গোপন সার্কুলারের মাধ্যমে যে বিপুল অ-পাহাড়ি পুনর্বাসন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা অবহিত। এ কাজ এ দেশের শাসক সংখ্যালঘু লুটেরা ধনিক বণিক শ্রেণীর সরকারসমূহ করে আসছে উগ্রজাতীয়তাবাদের আবরণে এবং পাহাড়ি জনগণের উপর শোষণ-শাসন বলবৎ রাখতে অ-পাহাড়িদের পুনর্বাসনের ধারা অব্যাহত রেখে পাহাড়ি জনগণের সাথে অ-পাহাড়ি জনগণের 'বিরোধ' সৃষ্টির মাধ্যমে। এই 'বিরোধ'কে সামনে রেখে এরা সামরিকীকরণের প্রক্রিয়াকে গ্রহণযোগ্য করবার অপচেষ্টায় লিপ্ত। আমরা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, মনে করি পার্বত্য এলাকাসহ দেশের যে কোন স্থানে সামরিকীরণের বিরোধিতা করা ছাড়া গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এক কদমও অগ্রসর হতে পারে না।

আমরা পার্বত্য এলাকার বিপুল অ-পাহাড়িদের তথাকথিত পুনর্বাসনের প্রতারণার বিরোধিতা করি। কেননা অ-পাহাড়ি, সমতলের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর এই সংখ্যালঘু লুটেরা ধনিক-বণিক শ্রেণী ও তাদের সরকারসমূহ এক স্বৈরতান্ত্রিক, শোষণ-নির্যাতনমূলক শাসন ব্যবস্থা কায়েম রেখে বাঙালি স্বার্থরক্ষার নামে গরীব বাঙালিদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করছে।

প্রশ্ন : পাহাড়ি ছাত্ররা বরাবরই তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতধারায় মিলিত হবার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তাদের আন্দোলনের প্রবাহকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে আপনারা কি ভূমিকা নিতে পারেন?

ফ. হা. : পাহাড়ি ছাত্রদের দাবি-দাওয়া নিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক মূল স্রোতধারায় মিলিত হতে গেলে দেশের জনগণের, বিশেষত শ্রমজীবী জনগণের দুশমন, সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী শক্তির খেদমতগার দেশীয় লুটেরা ধনিক-বণিক শ্রেণী, তাদের সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের বিরুদ্ধে, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পাহাড়ি জনগণের সাথে দেশের ব্যাপক অ-পাহাড়ি জনগণের কোন বিরোধ নেই। শাসক গোষ্ঠী সৃষ্ট বিরোধকে সামনে এনে ব্যাপক জনগণকে বিভ্রান্ত, প্রতারিত ও বিভক্ত করছে। মেহনতি জনগণের মুক্তির রাজনীতিই বাঙলাদেশের জনগণের মূল স্রোতধারার রাজনীতি। এ রাজনীতির অংশীদার বাঙালি শ্রমজীবী জনগণ ও পাহাড়ি শ্রমজীবী জনগণ। শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক শক্তির বিকাশে আমরা সক্রিয় রয়েছি।

প্রশ্ন : বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের আন্দোলনের ফলাফল কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবির সাথে আপনি কি একমত?

ফ. হা. : বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের আন্দোলনকে মেহনতি জনগণের মুক্তির রাজনীতির অধীনস্ত করবার দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়েই আন্দোলনের ফলাফল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্বায়ত্বশাসনের দাবির সাথে আমরা একমত।

প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি অন্যতম জাতীয় সমস্যা। অথচ এ সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্ভাগ্যজনকভাবে উদাসীন। এর সমাধানের দাবি শুধু সেখানকার অধিবাসীদের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাই এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার জন্য আপনাদের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

ফ. হা. : পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি অন্যতম জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা। এর সমাধানের দাবি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের বিষয়টি উপরেই বলা হয়েছে।

রাডার,

১৬ ডিসেম্বর ১৯৯১

কবিতা চাক্‌মা *

কল্পনা চাকমার স্মৃতি

কল্পনার সাথে শেষ দেখা হয়েছিলো ঢাকায় ২০মে ১৯৯৬, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে। সেই একই সময়ে 'হিল উইমেন্স ফেডারেশন' ঢাকা শাখার কাউন্সিল হয়েছিল। কাউন্সিলে কল্পনা চাক্‌মা যে বক্তব্য রেখেছিল তা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। সম্ভবত কল্পনা চাক্‌মার এটিই হবে শেষ রাজনৈতিক বক্তৃতা। আজ তার কথা মনে পড়লে মনে হয় এক্ষুণিই কল্পনা আবার আমাদের মাঝে হাজির হবে।

কল্পনার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল তিরানব্বই সালে। তখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সংগঠন পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে সাংগঠনিক সফরে বাঘাইছড়ি গিয়েছিলাম। বাঘাইছড়িতে বিশাল সমাবেশ হয়েছিল। সমাবেশ সফল করার জন্য তার কর্মতৎপরতা সফরকারী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে, নেতৃত্ব দিতে দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। এরপর কল্পনাসহ আরো অনেক মেয়ে একত্র হয়ে ঘরোয়াভাবে আলোচনায় বসি। সেই আলোচনায় আমাদের সফরকারী দলের পক্ষ থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। কল্পনা চাক্‌মা উক্ত আলোচনায় এ এলাকার পরিস্থিতি, নারীদের অবস্থা অত্যন্ত সাবলীল ও সুন্দরভাবে তুলে ধরে। নারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের আন্দোলনকে যুগের দাবি অভিহিত করে বাঘাইছড়িতে শাখা খোলার আগ্রহ প্রকাশ করে। সফরকারী দল আমরা তাদের আগ্রহ ও কর্মতৎপরতা দেখে বাঘাইছড়িতে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। দেখা গেল আহবায়ক কমিটিতে কল্পনাকেই দেয়া হলো আহবায়কের পদটি। সেই থেকে কল্পনার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, নিয়মিত যোগাযোগ হতো। কল্পনার নেতৃত্বে আহবায়ক কমিটিকে অল্প কিছু দিনের মধ্যে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করায় আঞ্চলিক কমিটি, স্কুল কমিটি, কলেজ কমিটি গঠন করে এলাকায় দ্রুত সাংগঠনিক কার্যক্রম প্রসারিত করে। আহবায়ক কমিটিকে যখন পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে পরিণত করা হয় তখনও কল্পনাকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেই থেকে যোগাযোগ আরো বেড়ে গিয়েছিল। কল্পনা সব সময় নারী সমাজের কথা, জুম্ম জনগণের সুবিধা আদায়ের কথা, আন্দোলন কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায়, কিভাবে সংগঠনকে পরিচালনা করবে এ

---

* সহ-সভানেত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল উইমেন্স ফেডারেশন

সব বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা চাইতো। আবার হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিভিন্ন কর্ম কৌশলের নিখুঁত পর্যালোচনা করে তার মতামত প্রকাশ করতো। কল্পনার অনেক মতামত পরামর্শ ফেডারেশনের নীতিমালাকে শক্তিশালী করেছে।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৩ খাগড়াছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও কাউন্সিল হয়। সম্মেলনে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে, কল্পনার নেতৃত্বে বাঘাইছড়ি থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলো। তার কর্মতৎপরতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তাকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। এ সম্মেলনেও তার ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা নজর কাড়ে।

১৯৯৫ এর মে মাসে খাগড়াছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। সেখানে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র, দাবিনামা মূলমন্ত্র সংশোধন সংযোজন করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তার ভূমিকাকে এক কথায় বলবো চমৎকার ও অনুসরণ করার যোগ্য।

ছিয়ানব্বই এর মে মাসের একটি ঘটনা। সে সময় সেনাবাহিনীর মদদে সমাজের কুলাঙ্গার বদমাইস, সাঁসী, পি. পি এস পি সি (স্থানীয় ভাষায় মুখোশ) সদস্যরা খাগড়াছড়িতে যত্রতত্র সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তিন সংগঠনের নেতা কর্মীদেরকে হুমকি দিচ্ছে, অপহরণ করছে ও মারধর করছে। আমি সংগঠনের কাজে ঢাকা থেকে বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঠিক সে দিনই কল্পনা বাঘাইছড়ি থেকে আমাদের বাসায় এসেছিল। তার সাথে এলাকার সংগঠনের ও সামগ্রিক CHT পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়। সন্ধ্যার পর পাশের এক প্রতিবেশী এসে খবর দিলো পাড়ায় একটি আর্মী পিকআপে করে মুখোশধারীরা এসেছে। তাদের মোটিভ দেখে মনে হয়েছে আমাদের বাড়ীটাই তাদের টার্গেট। সেদিন আর দুজনের বাসায় থাকা হলো না। অন্যত্র থাকতে হয়েছে। সেই মুহূর্তে কল্পনাকে দেখেছি সে আমার জন্য কতো চিন্তিত ছিল। সে আমাকে সাহস না হারাবার জন্য অনেক কথা বলেছিলো। কিন্তু কি নির্মম পরিহাস। একদিন তাকেই রাত্রে তুলে নিলো সেনাবাহিনীরা। সে আর ফিরে আসতে পারেনি। আর ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কল্পনার সাথে অতীতের এই খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলি এখনো আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। এক রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখে আর ঘুমুতে পারিনি এবং বারে বারেই স্বপ্ন দেখি। এখনো ভাবতে খুবই কষ্ট হয় কল্পনা আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছে, আমরা তাকে হারিয়েছি।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই কল্পনা পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত নিপীড়ন নির্যাতন তুলে ধরতে ও জুম্ম নারী সমাজকে জাগিয়ে তুলতে ও সংগ্রামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে সব সময় কাজ করতো এবং প্রতিটি মুহূর্তে কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতো।

বাঘাইছড়ির এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও তার চিন্তা, চেতনা ছিল অগ্রসর ও প্রগতিশীল। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও বিভিন্ন বই, পত্রিকা, সংগ্রহ করে পড়তো। বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন জনের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখতো। সে এলাকার পরিস্থিতি, সেনা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নারীদের অবস্থা ও কি ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতায় নারীদেরকে থাকতে হয় তা জানতো। তার বক্তব্য একটি কথায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, সেনা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ও নির্যাতিত হয়। শেষ পর্যন্ত অনেক জুম্ম নারীর মত কল্পনাকেও সেনাবাহিনীর দ্বারা অপহৃত হতে হলো। অপহরণের ৯ মাস পরে তার কোন হদিস মিলেনি, উদ্ধার করা যায়নি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করলেও এ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করা হয়নি, অথচ ইয়াসমিন, সীমা হত্যাকারীদের তদন্ত করে বিচার কাজ চলছে।

কল্পনার অপহরণকারীদের চিহ্নিত করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। প্রশ্ন জাগে সেনাবাহিনী কর্তৃক যে জুম্ম নারীরা নির্যাতিত লাঞ্ছিত হচ্ছিল সেগুলো প্রকাশ করে দেয়া কি কল্পনার অপরাধ হয়েছিল? আর সরকারের দায়িত্ব কি শুধু ঐ তদন্ত কমিটি গঠন করা পর্যন্ত? আওয়ামী লীগ বার বার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের কথা বলে আসছে। পাহাড়ী জনগণ চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। পূর্বেকার সরকারের আমলে বিভিন্ন গণ হত্যার তদন্ত কমিশন গঠন করা সত্ত্বেও তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারও সেই পথ অনুসরণ করে কল্পনা অপহরণের রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করেনি। অদূর ভবিষ্যতে করবে কিনা তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ।

কল্পনা অপহরণের ঘটনা দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীর ঘৃণ্য মুখোশ আরো একবার দেশে বিদেশে উন্মোচিত হলো। কল্পনা অপহরণের ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এ যাবৎ কতো কল্পনা যে সেনাবাহিনী দ্বারা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপহৃত হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। এই সব ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তাদের অপকীর্তি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু কল্পনা অপহরণের ঘটনায় থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছিলো। ধামাচাপা দিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, রাজনৈতিক দল কল্পনাকে উদ্ধারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলো, জাতীয় পত্র পত্রিকাগুলি কল্পনা অপহরণের ব্যাপারে ফলাও করে খবর ছাপিয়েছে।

কল্পনার অপহরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করে, যতদিন সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকবে ততদিন জুম্ম নারীরা নিরাপদে থাকতে পারবে না। তাদের মান সম্মান, ইজ্জত নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব হবে না। পার্বত্য

চট্টগ্রামে নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। জুম্ম নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার সেনাবাহিনীর Counter insurgency-র একটি কৌশল। কল্পনা এ সবের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। সে এ সবের প্রতিবাদ করতো এবং প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। সে পার্বত্য চট্টগ্রামে সব ধরনের নির্যাতনমুক্ত এক সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল, যে সমাজে নারী পুরুষেরা পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বসবাস করবে। সে সমাজের যাবতীয় পিছুটান, রক্ষণশীলতা, পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। কল্পনার স্বপ্ন এখনো বাস্তবায়িত হয়নি, কিন্তু সময় এসেছে নারী সমাজের জেগে উঠার, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবার, কল্পনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার।

কল্পনার অপহরণের পর বলতে গেলে সবাই নিদারুণ ব্যথিত হয়েছেন। অনেকেই এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। কিন্তু বর্তমানে কল্পনার বৃদ্ধা মা, দুই ভাই, বৌদি কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তার খবর কেউ নিয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তারা যে কি দুর্বিষহ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তা ভাবাই যায় না। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে, কল্পনা অপহরণের ঘটনা যেন তাদেরই অপরাধ। এখনো সেনাবাহিনীরা তাদের বাড়ির আশে পাশে, কখনো দিনে, কখনো রাত্রে তল্লাশি চালায়। অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ করে, মানসিকভাবে তাদেরকে চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে, নির্যাতন করা হচ্ছে। সরকার অপহরণের মূল হোতাকে ক্যাপ্টেন পদে প্রমোশন দিয়ে পুরস্কৃত করেছে। তার সহযোগী দুই ভিডিপি সদস্য (যাদেরকে কল্পনার ভাই চিনেছিলো) প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনো পর্যন্ত কোন বিহিত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অপর দিকে কল্পনার দুই ভাই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঘরছাড়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। ৭০ বছরের বৃদ্ধা 'মা' মেয়ে হারানো বেদনায় শোকাহত হয়ে দিনাতিপাত করছেন। দীর্ঘ নয় মাসেও সরকার কল্পনার কোন সংবাদ দিতে পারেনি। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে কতো মায়ের কোল খালি হয়েছে তার কোন হিসাব নেই।

আমরা জানিনা, কল্পনাকে আমাদের মাঝে আর ফিরে পাবো কিনা? কিন্তু কল্পনার সাহস, দৃঢ়তা ও সংগ্রামী চেতনা আমাদেরকে সংগ্রামের পথে প্রতিনিয়ত মন্ত্রণা দেবে। কল্পনা বেঁচে থাকবে আমাদের চেতনার মাঝে।

অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জনাব হাবিবুর রহমানের নিকট তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পিজিপি-পিসিপি-হিল উইমেন্স ফেডারেশন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে ১২.৫.৯৬ প্রদত্ত স্মারকলিপি

প্রতি,

প্রধান উপদেষ্টা,

অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

মহোদয়,

জাতির এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা ও আসন্ন ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের যে গুরুভার কাঁধে নিতে সম্মত হয়েছেন এবং অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন— তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে এবং আপনার নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের এক কোণে নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন, অবহেলা আর উপেক্ষায় পড়ে থাকা এক অভিশপ্ত অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাতে এবং আমাদের অঞ্চলের বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে এসেছি।

জনাব প্রধান উপদেষ্টা,

বিশ্বের যে ক'টি ভাগ্যবিড়ম্বিত লাঞ্ছিত জাতির দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণার কথা আমরা জানি, আজ এটা এক নিদারুণ সত্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ভোগান্তি তাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়।

পাকিস্তানি শাসনামলে এই পূর্ব বাংলার বাঙালিদের যে অবস্থা ছিল, প্যালেস্টাইনি জনগণের উপর যে নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চলেছে, কুর্দি জনগোষ্ঠির আজ যে দুর্বিসহ দিন যাচ্ছে, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হবার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ইহুদি জনগোষ্ঠীর যে চরম দুর্দিন গেছে—পার্বত্য চট্টগ্রামেও এক কথায় বলতে গেলে সংখ্যালঘু পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের জীবনে তাই ঘটছে।

এই উপমহাদেশে তথা এ দেশেও অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতন হয়েছে। ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের অভাগা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে তাদের ভাগ্য।

উপনিবেশিক দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসন অতিক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তান শাসনামলের সিকি শতাব্দীর লাঞ্ছনা-বঞ্চনার দিনেরও অবসান হয়েছে। দেশ আজ স্বাধীন, মুক্ত।

দেশকে গড়ার, সমৃদ্ধ করে তোলার এবং স্বাধীন দেশে ভয়ভীতিহীন মুক্ত পরিবেশে প্রকৃত নাগরিকের মান-মর্যাদা নিয়ে গর্ব ভরে বেঁচে থাকার সাধ-সংকল্প পার্বত্য

চট্টগ্রামের পাহাড়িদেরও ছিল। তাই '৭১ সালে গোটা দেশবাসীর সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সবার মতো স্বপ্ন দেখেছিল একটি স্বাধীন মুক্ত দেশের।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। দেশ স্বাধীন হবার পর সারা দেশের জনগণের সাথে বিজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা আর নতুন আশায় উজ্জীবিত হবার পরিবর্তে ভয়ে-আতঙ্কে তাদের বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। '৭১ সালে বিজয় দিবসের মাত্র কিছু দিন পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল পানছড়ি-ভাইবোন ছড়ায় হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। সেই থেকে রক্তক্ষরণের পালা। '৮০ সালে কাউখালীর কলমপতি হত্যাকাণ্ড, '৮৪তে হরিণা-ভূষণছড়া, '৮৬তে পানছড়ি-দিঘিনালা, '৮৮তে সার্বোতলী-কাচলং, '৮৯-এ লংগুদু, '৯২-এ ভয়াবহতম লোগাং হত্যাযজ্ঞ আর ৯৩-এ নানিয়াচর হত্যাকাণ্ড সহ এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে ডজনের অধিক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। এসব হত্যাযজ্ঞের কোন সরকারি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়নি। হত্যাকারীদেরও সাজা হয়নি।

সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান,

দেশ স্বাধীন হবার পর অত্যন্ত সঙ্গত কারণে, তৎকালীন সময়ে গঠিত 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে' পার্বত্য-চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে জাতিসত্তার 'স্বীকৃতি' ও 'অধিকার' নিশ্চিতকরণের দাবি জানানো হয়েছিল। উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামলেও জাতিসত্তাসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "বিশেষ অঞ্চলের" মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। পাহাড়িদের অনগ্রসরতা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে ১৯০০ সালের বিশেষ শাসনবিধিও প্রণয়ন করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের মতো ধর্মান্ধ রাষ্ট্রেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করা হয়নি। অথচ, দেশ স্বাধীন হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলন ঘটানোর পরিবর্তে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল সংবিধান থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যেটুকু মর্যাদা ছিল স্বাধীনতার পরে সংবিধানে তার ছিটেফোটাও রাখা হলো না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় আজ অবধি অতীতের সেই ভুলের জের চলছে। সংবিধানে উল্লেখ নেই—এই অজুহাতে বিএনপি সরকার ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হয়ে পার্বত্য সমস্যার সমাধান করেনি। শুধু দফায় দফায় বৈঠক করে কালক্ষেপন করেছে। এরশাদ সরকারও তার শাসনামলে বৈঠক করে সময় পার করে দিয়েছে।

জনাব প্রধান উপদেষ্টা,

নব্বই-এর উত্তাল গণআন্দোলনে এরশাদ শাহীর পতন হলে, সেবারও জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ মুহূর্তে দেশে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল।

তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশে একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় প্রশ্ন থেকে গেছে।

তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ জাতীয় সন্ধিক্ষণে গুরু দায়িত্ব পালন করার দুর্লভ সুযোগ হাতে পেয়েও, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের বেলায় তিনি উদার পক্ষপাতমুক্ত, রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টি নিয়ে সে

করতে পারেননি, তা দুঃখজনক হলেই সত্য। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি পার্বত্যবাসীদের হতাশ করেছিলেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীনের শাসনামলে স্বৈরাশাসক এরশাদের প্রবর্তিত ৬৪টি জেলা পরিষদের ৬১টি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদকে ভেঙ্গে দেয়া হয়নি।

অথচ, এরশাদশাহী সেই জেলা পরিষগুলো জোরজবরদস্তি করে চাপিয়ে দিয়ে 'রাজনৈতিক সমাধান' বলে বাজিমাৎ করতে চেয়েছিল।

বিএনপি সরকার '৯১-এ জনতার ম্যাণ্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে সততা, আন্তরিকতা ও দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে পারেনি। ক্ষমতার মেয়াদকালে তিন তিনটি বছরই দফায় দফায় সমাধানের নামে বৈঠক চালিয়ে কালক্ষেপন করেছিল মাত্র।

দেশে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদল ও জনগণের আন্দোলন তীব্র হলে, বিএনপি সরকার প্রথমে বিতর্কিত নির্বাচন ও পরে বাধ্য হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে পাশ কেটে পড়ে।

জনাব উপদেষ্টা,

এরশাদ সরকারও পূর্বে '৮৫ সনের দিকে অবৈধভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে, সমাধানের নামে আলোচনা চালিয়েছিল। বৈঠকের নামে তিনটি বছর পার করে দিয়েছিল। শেষমেষ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমত উপেক্ষা করে নির্বাচন নামের এক প্রহসন করে '৮৯ সনের জুনে তথাকথিত "স্থানীয় সরকার পরিষদ" ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল। আজো ঐ বিতর্কিত ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে বহাল রয়েছে। ঐ ব্যবস্থাকেই কখনো কখনো 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাধান' বলে দেশের ও বাইরের জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনুকরণে কিছু সরকারি দোসর সুবিধাবাদী গণদুশমন দিয়ে সরকারি ব্যবস্থার স্বপক্ষে সাফাই গাওয়ানো হয়।

জনাব উপদেষ্টা,

ক্ষমতায় থাকা কালে বিএনপি সরকার দেশে কি যে কাণ্ডকারখানা করেছে, তা দেশবাসী, বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। এরশাদশাহী নব্বইয়ের দিকে ক্ষমতায় থাকার উদগ্র বাসনায় বহু গর্হিত কাজ করেছে--তাও দেশবাসী ভুলে যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামেও, বিএনপি সরকার এবং এরশাদ সরকার মানবতাবিধ্বংসী জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করেছিল। তাদের শাসনামলে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ও হত্যাধ্বসযজ্ঞ হয়েছিল। বিতর্কিত ১৫ই ফেব্রুয়ারি '৯৬ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ক্ষমতায় থাকার জন্য বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে অঢেল সরকারি সম্পদ ও বিপুল অর্থ শ্রাদ্ধ করে, তিন গণতান্ত্রিক সংগঠনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিল। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদ ও সহায়তায় এ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাদের হামলায় খাগড়াছড়িতে ৭ই মার্চ অমর বিকাশ চাকমা (২০) ও ৩১শে মার্চ ক্যাজাই মারমা (২০) খুন হয়েছিল। খাগড়াছড়ি গভ: স্কুলের হোস্টেলে সন্ত্রাসীগোষ্ঠী তথাকথিত পিপিএসপিসি'কে আশ্রয় দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন অপরাধের দাগী আসামীরা প্রশাসনের নাকের ডগায় মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে সরকারি হোস্টেলে রাজকীয়ভাবে অবস্থান করছে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের কথা বলা হলেও, প্রশাসন তাদের ব্যাপারে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বিকার। সরকারি হোস্টেলে অবস্থান করেই সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়িতে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশের অবস্থা হ-য-ব-র-ল হলে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীদের লাভ। নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অটুট রাখার হীন উদ্দেশ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের কায়েমি স্বার্থবাদী সেনা আমলা-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নানান জিগির তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। এতে দেশ-জনগণ-সমাজ কারোরই লাভ হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থিতিশীল, অশান্ত অবস্থায় রাখতে পারলে একশ্রেণীর আমলা, সেনাকর্তা, ব্যবসায়ী ও লুটেরা গোষ্ঠীর ভীষণ লাভ। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে দেখিয়ে, আন্দোলন দমনের নামে গরীব দেশের বাজেটের সিংহভাগ অর্থ প্রতিরক্ষাখাতের নামে নিজেদের পকেটস্থ করতে পারে। Counter insurgency operation এর নামে নিজেদের অপকর্ম জায়েজ করতে পারে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ইচ্ছেমতো লুটপাট করতে পারে।

নানান জিগির তুলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা নিজেদের কর্তৃত্বকে বজায় রাখতে পারে। দেশবাসী-জনগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য না দিয়ে, ধুম্রজাল সৃষ্টি করে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ-অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, নিরাপত্তা....ইত্যাদির জিগির তুলে প্রকারান্তরে তারা নিজেদেরকে জনতার রোষ থেকে রক্ষা করছে, নিজেদের অপরাধ আড়াল করে রাখছে। যেভাবে এরশাদ দেশে গণআন্দোলনের সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য অপকৌশলের আশ্রয় নিতেন।

জনাব উপদেষ্টা,

ইতিপূর্বে সরকারগুলোর দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক অদুরদর্শিতার কারণে দেশের প্রচার ও সংবাদ মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন ও জনগণ সম্পর্কে দেশবাসীর কাছে বিদ্বেষ সৃষ্টিমূলক অপপ্রচারণা চালানো হয়েছিল। এতে দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। অতীতের দলীয় সরকারগুলো অদূরদর্শী ও ঘৃণ্য কায়েমিস্বার্থের কারণে জাতীয়ভাবে বিরাটা ক্ষতি করেছিল।

অতীতের সরকারগুলো জাতীয় সংহতি, মূল স্রোতধারা ইত্যাদির কথা বলতো। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে জাতীয় মূল স্রোতধারায় একাত্ম করার কোন সুদুর প্রসারী বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়নি। বরং, জাতীয় সংহতিবোধ ও জাতীয় চেতনা সম্পর্কে পার্বত্যবাসীদের মন বিষিয়ে তোলার সম্ভাব্য সকল রকম অপচেষ্টা অতীতের সরকারগুলো চালিয়েছিলো।

দেশের আইন-আদালত ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি পাহাড়িদের আস্থা ও বিশ্বাস জন্মানোর মতো কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এমন ধরনের নজীর খুব একটা পাওয়া যাবে না।

স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব, বিমাতাসুলভ আচরণ পার্বত্যবাসীদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। স্থানীয় প্রশাসন অনেক আগেই পার্বত্যবাসীদের আস্থা হারিয়েছে।

দেশের নাগরিক হিসেবে যদি পার্বত্যবাসীরা এদেশের আইন-আদালতে সুবিচার না পায়, প্রশাসনে ঘেঁষতে না পারে, তাদের অভাব অভিযোগ কারো কাছে বলার-তুলে ধরার ভরসা না পায়—তাহলে আর কোথায়, কোন জায়গায় বা কোন দেশে তারা তা তুলে ধরার সুযোগ পাবে? কোন আইন-আদালত তাদের ন্যায় বিচার করবে? পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের মনে আস্থাহীনতা জন্মানোর এগুলোও বড় কারণ।

সত্যিকার জাতীয় সংহতি, চেতনা, মূল স্রোতধারার বিপরীতেই পাহাড়িদের ঠেলে দেবার অশুভ ষড়যন্ত্র এ যাবৎ চলে এসেছে। পাহাড়িদের বাদ দিয়েই সারাদেশে অতীতের সরকারগুলো পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের সাথে পার্বত্যবাসীদের মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হতে চলেছে।

সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা,

দেশে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গোটা দেশে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে গেলে, পার্বত্য চট্টগ্রামেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাদ দিয়ে কেবল দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে থাকে, তাহলে তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

"শান্তি", "গণতন্ত্র" অখণ্ড ও অবিভাজ্য বিধায়, পার্বত্য চট্টগ্রামেও সে সব বিষয় বাদ দেয়া সঙ্গত নয়।

দেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা সারা দেশবাসীর মতো পার্বত্যবাসীকেও আশান্বিত করেছে।

অতীতের দলীয় সরকারগুলো তাদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ ও অদূরদর্শিতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় যেসব পদক্ষেপ নিতে পারেনি—বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে সেসব পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানাই।

যেহেতু বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি জাতীয় সরকারও বটে। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পার্বত্যবাসীদের দীর্ঘদিনের সমস্যা নিরসনে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে এবং আগামীতে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করার লক্ষ্যে পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন নিম্নোক্ত দাবি উপস্থাপন করছে :

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে এতকাল যাবৎ পরিচালিত পূর্বেকার শাসকদের "দমন পীড়ন, জ্বালাও পোড়াও" নীতি বন্ধের নির্দেশ দিয়ে আয়োজিত সেনাশাসন তুলে নিতে হবে। সেনাবাহিনীরা যাতে স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, এলাকার হেডম্যান, কার্বারি ও এলাকার জনসাধারণের উপর অন্যায় খবরদারি ও জোরজবরদস্তি করতে না পারে-তার বিহীত ব্যবস্থা করে, সেনা অফিসারদের রাজনৈতিক ভূমিকা—যেমন এলাকায় এলাকায় পাবলিক মিটিং ; টিএনও, ইউপি চেয়ারম্যানদের বাদ দিয়ে নিজেদের রেশন, ঢেউ টিন ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ—বন্ধ করতে হবে।

২। খালেদা সরকারের আমলে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ড ও দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন "পাহাড়ি গণপরিষদ" "পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ" ও "হিল উইমেন্স ফেডারেশনের" নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা হুলিয়া তুলে নিয়ে, অন্যায়ভাবে আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

৪। পতিত সরকার বিএনপি নীলনক্সায় প্রণীত এবং সেনা তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট ও পরিচালিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের দাগী আসামী তথাকথিত পি.পি.এস.পি.সি. হোতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পি.পি.এস.পি. বা "পাহাড়ি গণপরিষদ-পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটিকে" নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এ যাবৎ তাদের পেছনে ব্যয়কৃত সমুদয় সরকারি অর্থের হিসেব প্রকাশ করতে হবে।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েনকৃত সামরিক, আধাসামরিক, পুলিশ, আনসার বাহিনীর ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বহিরাগতরা যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্বাচনী এলাকায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, তার বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীলতার স্বার্থে গণধিকৃত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে।

(প্রসিত বিকাশ খীসা)	(সঞ্চয় চাকমা)	(কবিতা চাকমা)
সাধারণ সম্পাদক	সাধারণ সম্পাদক	সহ সভানেত্রী
কেন্দ্রীয় কমিটি	কেন্দ্রীয় কমিটি	কেন্দ্রীয় কমিটি
পাহাড়ী গণপরিষদ	পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ	হিল উইমেন্স ফেডারেশন

কল্পনা চাক্‌মার অপহরণ ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক সম্মেলন

সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুরা,

আপনারা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আজ বড় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দু'টি কথা তুলে ধরার জন্য আমরা আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, আমাদের সংগঠনের নেত্রী কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদিকা কল্পনা চাক্‌মাকে ১৩/১৪ দিন পরও মুক্তি দেয়া হচ্ছে না। আমাদের প্রিয় সহযোদ্ধা কল্পনা চাক্‌মার ব্যাপারে আমরা দারুণ উদ্বিগ্ন। তার ভাগ্যে কি ঘটেছে আমরা আসলেই জানি না। আমরা সত্যিই ভীষণ বিচলিত।

৭১ সালের কালোরাত্রির দিনগুলোতে এদেশের বহু মা-বোন হারিয়ে গেছেন। সেই দুঃসহ দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজো অনেকে শিউরে উঠেন।

বন্ধুরা,

আজ এতোটি বছর পরও, আমরা সেই '৭১ সালে এদেশের মা-বোনেরা যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছিলো—তা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। এটা আমাদের বড় দুঃখ।

আজো আমরা সেই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা-ভীতি নিয়ে দিন যাপন করছি। কবে হবে অবসান এই অসহনীয় অবস্থার। আমরা আপনাদের মুখাপেক্ষী হয়েছি। আপনাদের শাণিত কলমের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সঠিক চিত্র ফুটে উঠলে আমরা অন্তত কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবো।

সাংবাদিক ভাইয়েরা,

আমাদের প্রিয় সহযোদ্ধা কর্মচঞ্চল এক প্রাণবন্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়ী বোন কল্পনা চাক্‌মাকে দুই সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে অপহরণ করে নেয়া হয়েছে। সেদিন ১১ই জুন দিবাগতরাত্রি ১টার দিকে লে. ফেরদৌস (কজইছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার, ১৭ ই. বি. রেজিমেন্ট) ও ভিডিপি প্লাটুন কমান্ডার নূরুল হকের নেতৃত্বে একদল সেনা ও ভিডিপি কল্পনা চাক্‌মাকে ধরে নিয়ে যায়। অপহরণকারী লে. ফেরদৌস ও ভিডিপি প্লাটুন কমান্ডার নূরুল হক নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামে কল্পনার বাড়ীতে হানা দেয়। গভীর রাতে পরিবারের অন্যান্য সদসস্যদের মতো কল্পনাও বাড়ীতে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো। অপহরণকারীরা বাড়ি ঘিরে ডাকাডাকি করে। আর্মিরা যে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে, পরিবারের সবাই জেনে যায়। সেজন্য কোন চিৎকার পর্যন্ত করার সাহস পায়নি। দরজা খুলতে একটু দেরি হলে, তারা দরজা কেটে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। [পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজনের গ্রামের বাড়িগুলো সবই বাঁশের তৈরি। বাঁশের দরজার দড়িতে আটকানো লাগারা (খিল ধরনের) কেটে তারা ঢুকে।]

ঘুম থেকে উঠিয়ে সবাইকে বৈঠকখানায় জড়ো করে। বাতি জ্বালাতে নিষেধ করে। একে একে নাম জিজ্ঞেস করে। কল্পনার ভাই লাল বিহারী চাক্‌মা (২৬) ওরফে ক্ষুদিরামকে নাম বলার সাথে সাথে বাড়ির উঠোনে বের করে। "স্যারের কাছে যেতে

হবে” বলে টেনে নিয়ে যায়। সনাক্ত করার জন্য তার মুখ বরাবর টর্চ জ্বালায়। চোখে আলো না পড়ার জন্য ক্ষুদিরাম হাত দিয়ে আলো প্রটেকশান করে। এতে লে. ফেরদৌস ও অন্যান্যদের মুখে আলো পড়লে ক্ষুদিরাম তাদেরকে স্পষ্ট চিনে ফেলে। সে লে. ফেরদৌসকে আর্মির ক্যামোফ্লাজ গেঞ্জি পরা অবস্থায় দেখতে পায়। কাছে থাকা ভিডিপি প্লাটুন কমাণ্ডার নূরুল হক পিতা, মৃত মুন্সি মিঞা ও ভিডিপি সালেহ আহম্মেদকে চিনে ফেলে।

লে. ফেরদৌস ক্ষুদিরামকে কুয়ার ঘাটে নিয়ে যেতে তার জোওয়ানদের অর্ডার দেয়। এটি কল্পনাদের বাড়ির পশ্চিমে প্রায় দেড়শ গজ দূরে হবে। (সেখান থেকে তাদের পরিবার পানি তোলে।) কুয়ার ঘাটে নিয়ে ক্ষুদিরামের চোখ বেঁধে দেয়া হয়। দু হাত সামনে জড়ো করে বেঁধে দেয়।

প্রায় ১০/১৫ মিনিট পরে কল্পনা সহ তার আরো এক বড় ভাই কালিন্দি কুমার চাক্মা (৩২) ওরফে কালীচরণকে কুয়ার ঘাটে নিয়ে আসে। কালীচরণকেও তারা চোখ বেঁধে দেয়। কল্পনাকে তখনও চোখ বেঁধে দিতে কালীচরণ দেখেনি। কল্পনা তার হাত ধরা অবস্থায় ছিলো। তাদেরকে সেখান থেকে আবার পশ্চিম দিকে নিয়ে যেতে থাকে। কুয়ার ঘাটের পশ্চিমে বেশ বড় বড় বিল রয়েছে। রীতিমতো নৌকা চলাচল করে। নিজের এলাকা বলে তারা জায়গাটা আন্দাজ করতে পারে। এভাবে কিছুদূরে নিয়ে যাবার পর ক্ষুদিরামকে বিলের পাড়ে নিয়ে হাঁটু পানিতে নামায়। তার বাম হাতে একজন ধরে রাখে এবং অন্যজনকে ফায়ার করার ইঙ্গিত দেয়। ক্ষুদিরাম আর মুহূর্ত দেরি না করে হাতের বাঁধন খুলে পানিতে ঝাঁপ দেয়। সাথে সাথে আর্মিরা ফায়ার করলেও সৌভাগ্যক্রমে সে অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে জান বাঁচাতে সক্ষম হয়।

এদিকে ক্ষুদিরামের বড় ভাই কালীচরণ ও কল্পনাকে আর্মিরা বিলের মাঝামাঝি পথে নিয়ে আসে। কালীচরণ গুলির শব্দ শুনলে, তার ভাইকে মেরেছে এই ভয়ে সেও জানপ্রাণ দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তাকেও সাথে সাথে গুলি করে। ভাগ্য ভালো, সেও অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যায়। কিন্তু সে আর কল্পনা চাক্মাকে সাথে নিয়ে যেতে পারেনি।

এ সমস্ত পুরো ঘটনাবলি জানতে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ক্ষুদিরাম রাত্রে আর বাড়ীতে ফেরার সাহস করেনি। সে প্রিয়রঞ্জন চাকমা (৫৫) নামে এক বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। ভোর হলে বাড়ীতে এসে সে পুরো ঘটনাবলি জানায়। সকালে গ্রামের লোকজন মিলে ঘটনাস্থল তদন্ত করতে যায়। ঘটনাস্থলে সামরিক কাজে ব্যবহৃত একটি খালী ব্যাণ্ডেলী পাওয়া যায়।

সকাল ৬.৩০ টার দিকে স্থানীয় উগোলছড়ি আর্মি ক্যাম্পে খবর দিতে গেলে ক্ষুদিরাম ও ইউপি মেম্বার পূণ্য রঞ্জন চাক্মাকে (৪০) লে. ফেরদৌস চোখ রাঙিয়ে অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করে। তাদের কোন কথা শুনতে চায়নি।

“ছালা, মদ খাইছ নাকি? পাগল নাকি? শান্তি বাহিনী থেকে কতদিন হলো এখানে এসেছো?”—এ ধরনের অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। তাদেরকে উল্টো দোষী বানিয়ে সন্ত্রস্ত করে রাখতে চায়। ক্যাম্পের এক মেজর সিরাজকে ঘটনাটি অবহিত করেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

পরে টি এন ও'র কাছে ঘটনাবলি জানালে, উনি থানায় এজাহারের পরামর্শ দেন। থানায় এজাহার দিতে গেলে ক্ষুদিরাম লে. ফেরদৌসকে চিনেছে উল্লেখ করলে, থানার

ওসি ধমক দেন। ক্ষুদিরামের জবানবন্দি থানায় লেখা হলেও, তার কাছ থেকে তাতে স্বাক্ষর নেয়া হয়নি।

ঘটনাটি রাঙ্গামাটির ডি সি ও এ,পিকেও অবহিত করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি থেকে এডিএম তদন্তে গেলে, কালীচরণ ও ক্ষুদিরামকে বাড়ীতে না থাকার পরামর্শ দেন।

বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য লিখিত আবেদন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ধর্ণা দিয়েও আজ পর্যন্ত কল্পনা চাক্‌মার কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

দেশে এই যদি অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে আমরা কোথায় যাবো???

কল্পনা চাক্‌মার ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশনের আগ্রহও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সারা দেশবাসী যখন ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক এই ফাঁকে এত বড় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেলো তার বিহিত ব্যবস্থা এতোদিন পরও হলো না। নির্বাচন শুরু হওয়ার ৭ ঘন্টা আগে কল্পনাকে অপহরণ করা হয়েছিল। এসব কিসের ইঙ্গিত বহন করে আপনারাই এর উত্তর খুঁজে বের করবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। দেশে আসলে কয়টি সরকার শাসনকার্য চালাচ্ছে—আমাদের প্রশ্ন জাগে।

সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ,

আপনারা জানেন, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনা বাহিনীর হাতে জিম্মি। সেখানে তারাই সবকিছু। নির্বাচন সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, ঐ নির্বাচনী ডামাডোলে তারা কল্পনা চাক্‌মাকে অপহরণ করে নিয়েছে।

এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত নারীদের উপর নিপীড়ন নির্যাতন চলছে। ইতিপূর্বেও বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী ওয়াই চিং মারমাকে আর্মি ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে ছবি তোলে, জোরপূর্বক সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়।

খাগড়াছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগঠন না করার জন্য হুঁশিয়ারী দিয়ে আসে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ সভানেত্রী কবিতা চাক্‌মার বাড়ীতে কয়েক বার হানা দেয়। তাকে হেনস্তা করার জন্য গুন্ডা মাস্তান ভাড়া করে।

সংগঠনের খাগড়াছড়ি জেলা সভানেত্রী নৈরঞ্জনা চাক্‌মাকে গতবছর সেনা আশ্রিত মাস্তান দিয়ে হেনস্তা করা হয় এবং সংগঠনের কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়। কল্পনা চাক্‌মার অপহরণের পর আর কোন ধরনের নিয়তি আমাদের অপেক্ষা করছে আমরা জানি না। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরো কোথায় কি ঘটছে, আসলে দেশবাসী কিছুই জানে না।

খাগড়াছড়ি জেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নে রাজকীনি ত্রিপুরাকে (১২), পিতা হলেন্দ্র ত্রিপুরা গেল ১৪ই মে সৈয়দ আলী নামে আনসারের এক সেপাই বলপূর্বক পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে যায়। ঘটনাটি দিনে দুপুরে উক্ত নরপশুটি ২নং প্রকল্প গ্রামে ঢুকে ঘটিয়েছে। সে কুকিছড়া আর্মি ক্যাম্পের ৮নং

চেকপোস্টে টহল দিতো। এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনাবলি দেশবাসীর অজান্তে ঘটে চলছে। এসবের প্রতিকার চেয়েও কিছুই হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত নিরাপত্তাবাহিনী নিরাপত্তার নামে নিরীহ পাহাড়ীদের নিরাপত্তা হরণ করে চলেছে। এর ভূরি ভূরি নজির রয়েছে।

সাংবাদিক ভাইয়েরা,

আপনাদের মাধ্যমে আমরা কল্পনা চাক্‌মার অপহরণের প্রেক্ষিতে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরতে চাই :

১। অবিলম্বে কল্পনা চাক্‌মাকে উদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। অপহরণের ঘটনাবলি সরেজমিনে তদন্তের জন্য একটি বিচারবিভাগীয় কমিটি গঠন করতে হবে।

৩। অপহরণের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। অপহৃত কল্পনা চাক্‌মাকে যে কোন শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতনের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫। ভবিষ্যতে আর যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে।

কল্পনা চাক্‌মার মুক্তির দাবিতে আগামীকাল ২৭শে জুন ঢাকায় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীক অনশন পালন করা হবে। ২৮শে জুন তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ডাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় অর্ধদিবস শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হবে।

আমাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে সহায়তা দেয়ার জন্য আপনাদের আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

জাতীয় প্রেস ক্লাব

২৬শে জুন, ১৯৯৬

১. কবিতা চাক্‌মা, কেন্দ্রীয় সহ সভানেত্রী, হিল উইমেন্স ফেডারেশন
২. সমারী চাক্‌মা, কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদিকা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন
৩. রিপু চাকমা, সভানেত্রী, ঢাকা শাখা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন